গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬২ বর্ষ ৪২ সংখ্যা ১১ - ১৭ জুন, ২০১০ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

পুরনির্বাচনে জনমতের রায়

সিপিএম ও কংগ্রেস উভয়েরই বিরুদ্ধে

দীর্ঘদিনের জমে থাকা ক্ষোভ, বঞ্চনা, মুখ বুজে সওয়া অত্যাচারের জবাব এ রাজ্যের মানুষ আবেগভরে দিয়েছিল গত লোকসভা ভোটে। আর ৩০ মে'র পৌরভোটে মানুষ জবাব দিয়েছে বিপুলতর আবেগে — নির্বাচনের সামগ্রিক ফলাফলেই এ কথা পরিষ্কার।

রাজ্যের যে ৮১টি পুরসভায় ভোট হল, তার মধ্যে সিপিএম জয়ী হয়েছে মাত্র ১৮টিতে। গতবার ২০০৫-এর ভোটে বামফ্রন্ট পেয়েছিল ৫৪টি বোর্ড, এবার ৩৬টি হারিয়েছে তারা। আবার, যেসব পুরসভায় এবার সিপিএম বোর্ড করছেও, সেখানেও তাদের আসন সংখ্যা গতবারের চেয়ে কমেছে। এই নির্বাচনী ফলাফল থেকে এ কথা পরিষ্কার যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ প্রবল ঘৃণায় সিপিএমকে প্রত্যাখ্যান করেছে। কলকাতা পুরসভা নির্বাচনে বিরাট পরাজয় ছাড়াও পূর্ব মেদিনীপুর থেকে হুগলী হয়ে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল, এমনকী বর্ধমান বা পশ্চিম মেদিনীপুর — সর্বত্রই বিপুলভাবে শক্তি খর্ব হয়েছে সিপিএমের। এ কথা দিনের আলোর মতই পরিস্ফুট হয়েছে যে সিপিএমকে রাজ্যের মানুষ আর চায় না।

এই নির্বাচন থেকে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও পরিষ্কার হয়েছে। সিপিএমের মতো কংগ্রেসকেও যে মানুষ ঘৃণা করে, তা কংগ্রেসের পুরবোর্ডের সংখ্যা ১৭ থেকে ৭টিতে নেমে আসার দ্বারাই বোঝা যাচ্ছে। কলকাতায় কংগ্রেসের আসন ২১ থেকে কমে হয়েছে মাত্র ১০। ফলে এই পৌরনির্বাচনে মানুষ যে শুধু সিপিএমের বিরুদ্ধেই রায় দিয়েছে তা নয়, রায় দিয়েছে কংগ্রেসের বিরুদ্ধেও। ফলাফলেও স্পষ্ট যে, রাজ্যের সিপিএম এবং কেন্দ্রের কংগ্রেস — উভয় সরকারের চূড়ান্ত জনবিরোধী নীতি এবং চরম অপশাসনের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের আন্দোলনমুখী জনমানস প্রতিবাদে ফেটে পড়তে চায়।

মানুষ দীর্ঘদিন ধরে প্রত্যক্ষ করেছে এই দুই সরকারের যুগলবন্দী, তাদের চরম জনস্বার্থবিরোধী ভূমিকা। পশ্চিমবঙ্গের বিরাট সংখ্যক বামপন্থী মনোভাবাপন্ন মানুষের ভোটে জিতে আসা বামফ্রন্ট তথা সিপিএম ফ্রন্টের দীর্ঘ অবাম শাসন, দুর্নীতির পাঁকে নিমজ্জিত নেতা-মন্ত্রীদের জমিদারসুলভ আচরণ, এলাকায় এলাকায় পার্টির বড়-মেজো-সেজো নেতাদের মৌরসীপাট্টা ও সযত্নে সৃষ্টি করা ভীতির পরিবেশ, সর্বোপরি জনগণের প্রতিবাদ আন্দোলন দমনে পুলিশি নির্মম অত্যাচার — দীর্ঘ তিন দশক ধরে চলে আসা সিপিএম ফ্রন্টের এইসব কার্যকলাপের ফলে রাজ্যে তৈরি হয়েছিল এক দমবন্ধ করা পরিস্থিতি। এ রকম পরিস্থিতিতেই ঘটে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ঐতিহাসিক গণআন্দোলন, যা সর্বস্তরের জনসাধারণের একদম ভিতরে নাড়া দিয়ে বহুদিন ধরে জমতে থাকা প্রতিবাদী মননের বারুদস্তূপে আগুন ধরিয়ে দেয়। জনতার প্রতিবাদী মনে এ কথাও ধরা না পড়ে পারেনি যে এই চরম দুর্বিষহ অবস্থার জন্য সমভাবেই দায়ী কংগ্রেসও। একদিকে কেন্দ্রের সরকারে থেকে কংগ্রেসের অপশাসন, অন্যদিকে এ রাজ্যে সিপিএমের সঙ্গে কংগ্রেসের দীর্ঘদিনের প্রকাশ্য ও গোপন আঁতাত নানা ঘটনায় বারে বারে প্রমাণিত হয়েছে। মরিচঝাঁপি থেকে শুরু করে গত ৩৩ বছরে শাসক সিপিএম পশ্চিমবঙ্গে অত্যাচার ও অপশাসনের যে রেকর্ড করেছে, তা কংগ্রেসের সমর্থন ও সহায়তা ছাড়া সম্ভব ছিল না। এ রাজ্যে সিপিএম যখনই বিপদে পড়েছে, তাকে বাঁচাতে কংগ্রেস পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের সময়ে আরও পরিষ্কার হয়েছে তাদের এই ভূমিকা। নন্দীগ্রামের বীর যুবকদের রক্তে যখন লাল হয়েছে তালপাটি খালের জল বা সিঙ্গুরের জমি হারানো কৃষকের মর্মন্তুদ হাহাকারে যখন কেঁদেছে গোটা পশ্চিমবাংলা, তখনও কংগ্রেস থেকেছে কার্যত সিপিএমের পাশেই। জমি অধিগ্রহণ আর স্পেশাল ইকনমিক জোন চালুর তারাই যে উদ্যোক্তা!

রাজ্যবাসী আজ এই দুই দলকেই ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করেছে। সাথে সাথে এটাও প্রমাণ করেছে যে, এ রাজ্যে কংগ্রেসের সাহায্য ছাড়াই সিপিএম-কে হারানো সম্ভব। তবুও ফলাফলের পরিসংখ্যানকে বিকৃত করে কয়েকটি মহল ও সংবাদমাধ্যম মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য প্রচার তোলার চেষ্টা করেছে যে, পুরভোটের ফলাফল নাকি প্রমাণ করেছে, এ রাজ্যে কংগ্রেসকে ছাড়া ভোটে সিপিএমকে পরাস্ত করা সম্ভব নয়। বস্তুত এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রস্তাব মতো তৃণমূল কংগ্রেস যদি প্রথম থেকেই কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে চলার দৃঢ়তা দেখাতে পারত, তবে কংগ্রেস এই রাজ্যে আরও পর্যুদস্ত হয়ে যেত।

রাজ্যের বর্তমান এই রাজনৈতিক পরিস্থিতি একদিনে সৃষ্টি হয়নি। ১৯৭৭ সালে সিপিএম ফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর যখন সরকারের বিরুদ্ধে যেকোনও সমালোচনাকেই প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্র বলে সোরগোল তুলে কণ্ঠরোধ করা হত, চারদিকে ভীতির পরিবেশ, তখন প্রথম রাস্তায় নেমেছিল এককভাবে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)। সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে শুরু হয় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর নেতৃত্বে গণআন্দোলন। '৭৯ সাল থেকে প্রাথমিকে ইংরেজি ও পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক সংগ্রাম চলতে চলতেই নানা সময়ে মূল্যবৃদ্ধি ও বাসভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন, কৃষক-খেতমজুর-বিদ্যুৎগ্রাহকদের দাবি নিয়ে রক্তক্ষয়ী আন্দোলন, ছাত্র-যুব-মহিলাদের দাবি নিয়ে একটার পর একটা গণসংগ্রাম এ রাজ্যের বুকে একক

চারের পাতায় দেখুন

ভোপাল গ্যাসকাণ্ডে বিচারের প্রহসন ঃ ধিক্কার জানাল কেন্দ্রীয় কমিটি

অপরাধীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে ৯ জুন সারা ভারত প্রতিবাদ দিবস পালিত

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৮ জুন এক বিবৃতিতে বলেন,

''যে অপরাধের পরিণামে প্রায় ২৫ হাজার মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছে, দীর্ঘ বিষক্রিয়ায় প্রায় ৫৫ লক্ষ মানুষ কোনও না কোনও ভাবে আহত, পঙ্গু ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, দেশের মানুষ আশা করেছিল, সেই অপরাধের অতি দ্রুত পূর্ণ তদন্ত করা হবে এবং অপরাধীদের খুঁজে বের করে বিচার করা হবে, সত্বর কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। কিন্তু বাস্তবে জনগণের আশার সম্পূর্ণ বিপরীতে আদালত ও প্রশাসন একযোগে মামলার শুনানি নিয়ে অস্বাভাবিক শৈথিল্য দেখাল, 'নরহত্যার দণ্ডনীয়' অভিযোগকে পাল্টে দিয়ে 'নিছক অবহেলায় মৃত্যু' ঘটানোর অভিযোগ এনে অপরাধের গুরুত্ব লঘু করে দিল, দীর্ঘ ২৬ বছর ধরে মামলা চালাল,যার শেষ পর্যন্ত পরিণতি ঘটল ন্যায় বিচারের প্রহসনে।

হতবাক জনগণ দেখল, ইতিহাসের বৃহত্তম শিল্প বিপর্যয়ের জন্য অভিযুক্ত যে আটজনকে দোষী সাব্যস্ত করা হল, তাদেরও শাস্তি হিসাবে মাত্র এক লক্ষ টাকা জরিমানা ও দু'বছরের জেল দেওয়া হল। এবং প্রহসনের আরও জঘন্য নজির সৃষ্টি করে শাস্তির রায় ঘোষিত হওয়ার পরপরই, ঐ অপরাধীদের মাত্র ২৫ হাজার টাকার ব্যক্তিগত জামিনে মুক্তিও দেওয়া হল।

কমরেড প্রভাস ঘোষ আরও বলেন যে, এ কথাও স্মরণীয় যে, বর্তমানে কুখ্যাত ডাও কেমিক্যালসের মালিকানাধীন মার্কিন মাল্টিন্যাশনাল ইউনিয়ন কার্বাইডের চেয়ারম্যান ও চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসারকে গ্যাসকাণ্ডের পর পরই গ্রেপ্তার করেও তৎক্ষণাৎ জামিন দেওয়া হয়েছিল ও তারপর যাবতীয় আইনি প্রক্রিয়া এড়াবার জন্য ভারত সরকার তাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যাওয়ার সুযোগও করে দেয় এ কথা জেনেই যে, ভারত-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক চুক্তির শর্ত দেখিয়েই তার প্রত্যর্পণে মার্কিন সরকার আপত্তি জানাবে।

এছাড়াও সমগ্র অপরাধকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য ইউনিয়ন কার্বাইড কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সকল অপরাধমূলক অভিযোগ ভারত সরকার ১৯৮৯ সালে প্রত্যাহার করে নেয় এবং পরিবর্তে আদালতের বাইরে বোঝাপড়ায় আবদ্ধ হয়, যার দ্বারা অভিযুক্ত মার্কিন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি প্রত্যেক গ্যাসপীড়িতকে গড়ে মাত্র ১২ হাজার ৪১০ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিনিময়ে ছাড় পেয়ে যায়। সরকারের এই অমানবিক ও বর্বর আচরণের বিরুদ্ধে যখনই অসহায় গ্যাসপীড়িত মানুষ ও তাদের পরিবার-পরিজন প্রতিবাদে সামিল হয়েছে, তখনই তাদের জুটেছে উদ্ধত শাসকের বুলেট ও বেয়নেট। কংগ্রেস, বিজেপি বা সিপিএম সমর্থিত যুক্তফ্রন্ট — যারাই যখন ক্ষমতায় থেকেছে, কেউই গ্যাসপীড়িতদের ন্যায়বিচার দেওয়ার জন্য কোনও আগ্রহ কখনও দেখায়নি। বরং তারা সকলেই বেশি আগ্রহ দেখিয়েছে যাতে মানবতার বিরুদ্ধে এমন বর্বর অপরাধ করার পরও অপরাধী কর্পোরেট সংস্থা, সংশ্লিষ্ট শিল্পপতিরা ও তাদের তাঁবেদার কর্মকর্তারা কোনও শাস্তি না পায়।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, এমন একটি ভয়ঙ্কর ঘটনার পরও কংগ্রেস পরিচালিত ইউ পি এ সরকার তাদের প্রস্তাবিত অসামরিক পরমাণু সুরক্ষা দায়বদ্ধতা বিল, ২০১০-এ কোনও পরমাণু কারখানায় পরমাণুজনিত দুর্ঘটনা ঘটলে ঐ কারখানার মালিকদের দায়কে সর্বোচ্চ ৫০০ কোটি টাকা দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করেছে এবং অপরাধের অভিযোগ দূরের কথা, অন্য যাবতীয় অভিযোগ থেকেই মুক্ত রাখার ব্যবস্থা করেছে। ভোপাল গ্যাস কাণ্ড থেকে এই প্রস্তাবিত বিল — সমগ্র ঘটনা অত্যন্ত নগ্নভাবেই দেখিয়ে দিচ্ছে যে, সরকারের রঙ যাই হোক, পুঁজিবাদী ভারতে প্রশাসন ও আদালত আজ খোলাখুলি দেশি ও বিদেশি একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থের সেবা করছে এবং তাদের প্রতিটি কাজেই জনবিরোধী চরিত্র প্রকটভাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

সরকার ও সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের এমন অপরাধমূলক কার্যকলাপের সামনে মাথা নত না করে ন্যায়বিচার আদায়ের জন্য দেশজোড়া শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে জনগণকে আহ্বান

আটের পাতায় দেখুন

জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেসে নাশকতা

দায়িত্ব কার

পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহলে ঝাড়গ্রামের সরডিহা ও খেমাশুলির মাঝে গত ২৮ মে রাত দেড়টা নাগাদ নাশকতা ঘটিয়ে হাওড়া-কুরলা আপ জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেসকে লাইনচ্যুত করে দেওয়া হয় এবং তার অব্যবহিত পরেই উল্টোদিক থেকে ধেয়ে আসা লৌহ আকরিক বোঝাই একটি মালগাড়ির ধাক্কায় ট্রেনটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। এই মর্মান্তিক ঘটনায় সর্বশেষ সংবাদ অনুযায়ী, ১৪৩ জন যাত্রী নিহত হয়েছেন, আহত অসংখ্য, বহু নিখোঁজ ও অশনাক্ত। ঘটনার ভয়াবহতায় গোটা দেশের মানুষ শিউরে উঠেছে। দক্ষিণ-পূর্ব রেল সূত্রানুসারে, ট্রেনটিতে সংরক্ষিত আসনে যাত্রী ছিলেন ১১০০, অসংরক্ষিত কামরায় ছিলেন ১৫০ এবং রেলকর্মী ছিলেন ৬০ জন। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত কামরা এস ৩, এস ৪, এস ৫, এস ৬-এ মোট যাত্রী ছিলেন ২৬৩ জন। ফলে মৃতের সংখ্যা ১৪৩ ঘোষণা করা হলেও বাস্তবে তা আরও বেশি হওয়ারই সম্ভাবনা। আর আহত তো বাদবাকি সবাই। এই নাশকতায় যে পরিবারের মানুষ মারা গেলেন, স্ত্রী স্বামী হারালেন, মা সন্তান হারালেন, যে সন্তান কোনদিনই পাবে না তার বাবাকে, যে পরিবারে আজ শুধু কান্না আর আর্তনাদ — কী অপরাধ ছিল তাঁদের? এই মর্মান্তিক ঘটনায় শোকপ্রকাশের কোনও ভাষাই যেন যথেষ্ট নয়। সাধারণ মানুষ ও সকল রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকেই দোষীদের

দুয়ের পাতায় দেখুন

কমসোমলের শিক্ষাশিবির

২২-২৩ মে মুর্শিদাবাদের লালবাগ আবাস হলে এবং ২৬-২৭ মে দক্ষিণ ২৪ পরগণার দক্ষিণ বারাসাত গার্লস হাইস্কুলে কিশোর কমিউনিস্ট বাহিনী কমসোমলের শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয়। উন্নত চরিত্র, সামাজিক দায়িত্ববোধ, সাহসের সাথে অন্যায়ের মোকাবিলা, অত্যাচারিত মানুষের প্রতি দরদি মন, স্বাধীনতা সংগ্রামের আপসহীন ধারার বীর শহিদ ও মনীষীদের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের যোগ্য মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার ভাবনায় এই শিক্ষাশিবিরগুলি অনুষ্ঠিত হয়।

মুর্শিদাবাদের শিবিরে রক্ত পতাকা উত্তোলন ও শহিদ বেদিতে মাল্যদান করেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড সাধন রায়। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশনের পর জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড খাদিজা বানু শিক্ষা শিবিরের উদ্দেশ্য ও কমসোমলের করণীয় কাজ নিয়ে আলোচনা করেন। পরে কমরেড সাধন রায় বক্তব্য রাখেন। শিবিরের দ্বিতীয় দিনে দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষ বলেন, বর্তমান সমাজে অশ্লীল পত্র-পত্রিকা, বিজ্ঞাপন, ও শিক্ষার মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েদের যুক্তিহীন, স্বার্থপর ও সমাজবিমুখ করে দেওয়া হচ্ছে। এ থেকে নিজেদের মুক্ত রাখার জন্য বীর বিপ্লবী ও মহান মানুষদের জীবনীচর্চা সহ খেলাধুলা শরীরচর্চার মধ্য দিয়ে সৃজনশীল মন তৈরি করা ও নিঃস্বার্থভাবে সামাজিক দায়িত্ব পালনের জন্য এগিয়ে আসতে হবে।

দক্ষিণ বারাসাতের শিক্ষাশিবিরে আলোচনা করেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী ও রাজ্য কমসোমল ইনচার্জ কমরেড অঞ্জনাভ চক্রবর্তী। কমরেড সৌমিত্র ভাণ্ডারিকে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা ইনচার্জ করে ২০ জনের সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়। শিবিরে পি টি, প্যারেড ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সমস্ত প্রতিনিধিরা উৎসাহের সাথে অংশ নেয়।

প্রবীণ পার্টি কর্মীর জীবনাবসান

হুগলি জেলার বেগমপুর ইউনিটের আবেদনকারী সদস্য কমরেড আব্দুল হামিদ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৭ মে ৬৭ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ছয়ের দশকের শেষ দিকে অল ইন্ডিয়া ডি ওয়াই ও-র সঙ্গীত গোষ্ঠীর সাথে তিনি যুক্ত হন। পরবর্তীকালে তিনি মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং আঞ্চলিক পার্টি ইউনিটে যুক্ত হয়ে দলের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। অত্যন্ত দরিদ্র তাঁতি ঘরের সন্তান কমরেড হামিদ দারিদ্রের সাথে লড়াই করে সংগঠনের কাজ করতেন। বেগমপুরে হস্তচালিত তাঁতিদের আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

সদাহাস্যময় কমরেড হামিদ ভদ্রব্যবহারের জন্য এলাকায় খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। ঐ এলাকায় মোক্তাব প্রাইমারি স্কুলের পরিচালন সমিতিতে তিনি দীর্ঘদিন সদস্য ছিলেন। মানুষের সাথে আলাপচারিতায় পার্টির আদর্শ তিনি সহজ সরলভাবে প্রকাশ করতেন। এলাকার কিছু মানুষকে তিনি পার্টির সমর্থকে পরিণত করেছিলেন। শেষের দিকে অসুস্থতার মধ্যেও গত ২৪ এপ্রিল কলকাতার কেন্দ্রীয় সমাবেশে যোগ দিয়েছিলেন।

২২ মে বেগমপুর মোক্তাব প্রাইমারি স্কুলে প্রয়াত কমরেডের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রবীণ পার্টি সদস্য কমরেড দীপক দত্ত। প্রধান বক্তা ছিলেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) –এর হুগলি জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড পরিমল সেন।

কমরেড আব্দুল হামিদ লাল সেলাম

মধ্যপ্রদেশে এ আই কে কে এম এস-এর বিক্ষোভ মিছিল

৩১ মে রায়সেনের ওবেদুল্লাগঞ্জে মূল্যবৃদ্ধি, পানীয় জলের সমস্যা, বিদ্যুৎ সংকট, মাদকাসক্তি প্রভৃতির বিরুদ্ধে কালেক্টরেট অভিমুখে চলেছেন কৃষক ও খেতমজুররা

শান্তিকর্মীদের উপর ইজরায়েলি হানার নিন্দায় আই এ পি এস সি সি-র সম্পাদক কমরেড মানিক মুখার্জী

গাজা অভিমুখে পরিচালিত ত্রাণবাহী জলযানের উপর ইজরায়েলি আক্রমণের তীব্র নিন্দা করে ইন্টার ন্যাশনাল অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট অ্যান্ড পিপলস সলিডারিটি কো-অর্ডিনেটিং কমিটির (আই এ পি এস সি সি) সাধারণ সম্পাদক কমরেড মানিক মুখার্জী ৪ জুন এক বিবৃতিতে বলেন, অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডের মানুষদের জন্য মানবিক ত্রাণ নিয়ে যাওয়ার সময়ে আন্তর্জাতিক জলসীমায় ত্রাণবাহী জলযানের উপর ইজরায়েলের অপরাধমূলক আক্রমণের ঘটনার আই এ পি এস সি সি তীব্র নিন্দা করছে। এই ঘটনা জায়নবাদীদের কুৎসিত চেহারাকে আবার নগ্ন করে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক আইনকে পদদলিত করে ইজরায়েল ২০০৭ সাল থেকে গাজা ভূখণ্ড অবরোধ করে গাজায় মালপত্র চলাচল বন্ধ করেছে। ফলে গাজার মানুষ খাদ্য ও ওষুধের অভাবে প্রাণ হারাচ্ছে। সেখানকার বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি এবং নিকাশি ব্যবস্থা ইজরায়েল ধ্বংস করেছে। ঘর-বাড়ি ভেঙে সেই ধ্বংসস্তূপে বাস করতে মানুষকে বাধ্য করছে। খাদ্য-জল-জ্বালানি ও ওষুধের অভাবের মধ্যে নিরন্তর ইজরায়েলি বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র হানায় গাজা বাস্তবে নরকে পরিণত। এই অবরোধ মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ। গাজায় অবরুদ্ধ জনগণের জন্য খাদ্য, ওষুধ, চিকিৎসার সরঞ্জাম ও ইমারতি দ্রব্যাদি নিয়ে মানবিক ত্রাণ সাহায্যের জন্যই জলযানগুলি গাজা যাচ্ছিল। জলযানগুলি আন্তর্জাতিক জলসীমায় থাকাকালীন ইজরায়েলি কমান্ডোবাহিনী অতর্কিতে নিরস্ত্র শান্তিকর্মীদের উপর আক্রমণ চালিয়ে কমপক্ষে ৯ জনকে হত্যা করেছে, আহত কয়েক শত। চরম নিষ্ঠুরভাবে ইজরায়েলি হানাদাররা তাদের মেরেছে, এমনকী ইলেকট্রিক শক দিয়েছে। নানা দেশ থেকে আগত শান্তিকর্মীদের বেআইনিভাবে ইজরায়েলি জেলে বন্দি করা হয়েছে। অতি সম্প্রতি তাদের ফেরত পাঠানো হচ্ছে বলে জানা গেছে।

এই ব্যাপারে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীদের মনোভাব অত্যন্ত ঘৃণ্য। গোটা বিশ্ব যখন এই ঘটনার নিন্দায় মুখর তখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ অত্যন্ত ধূর্ততার সাথে ইজরায়েলকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্ট ইজরায়েলি আক্রমণকে 'অন্যায়' ও নিজের কাজের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য ইজরায়েলকে অনুরোধ করার বেশি কিছু করেননি। মার্কিন নেতৃত্বে যে সাম্রাজ্যবাদীরা সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ তুলে ইরাকে ভয়াবহ আক্রমণ চালাতে পারে, তারা এখন বেআইনিভাবে গাজা অবরোধ করার জন্য ইজরায়েলকে কোনও চরমপত্র দিচ্ছে না। এমনকী অসংখ্য যুদ্ধাপরাধে অপরাধী ইজরায়েলের উপর নিষেধাজ্ঞাও জারি করছে না। কোথায় তাদের আটকাচ্ছে? সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সহায়তা ছাড়া ইজরায়েল এভাবে বছরের পর বছর দস্যুবৃত্তি চালিয়ে যেতে পারত না। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির ইজরায়েল তোষণনীতি পরিত্যাগ করতে, গাজায় বেআইনি নির্মম গণবিধ্বংসী অবরোধ তুলতে এবং সার্বভৌম প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র মেনে নিতে ইজরায়েলকে বাধ্য করতে বিশ্বব্যাপী শান্তিকামী মানুষকে এগিয়ে এসে শক্তিশালী জঙ্গি আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আই এ পি এস সি সি আহ্বান জানাচ্ছে। আই এ পি এস সি সি প্যালেস্টিনিয় জনগণের নিজস্ব বাসভূমির দাবিতে সংগ্রামের প্রতি সমর্থন আবার ব্যক্ত করছে। জেরুজালেমকে রাজধানী করে সার্বভৌম প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গঠনের দাবিতে প্যালেস্টিনিয় জনগণের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানাচ্ছে।

জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেসে নাশকতা

একের পাতার পর

কঠোর শাস্তির দাবি করা হয়েছে। আমরা জানি না, এতবড় মর্মান্তিক গণহত্যা যারা ঘটাল, তারা ধরা পড়ে উপযুক্ত শাস্তি পাবে কি না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে অন্য যে গুরুতর প্রশ্নটি উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না, তা হলে জঙ্গলমহল জুড়ে যে কেউ চাইলেই এমন নরমেধ ঘটিয়ে দেওয়ার মতো পরিস্থিতি যে তৈরি হল, তার দায়িত্ব কার?

সমাজের সবচেয়ে বঞ্চিত, নিপীড়িত আদিবাসী মানুষের বাসভূমি এই জঙ্গলমহল। এই জঙ্গলমহল ছিল শান্ত। কোনও নাশকতামূলক ঘটনা, ট্রেনের ফিসপ্লেট খুলে দিয়ে, লাইন কেটে দিয়ে দুর্ঘটনা ঘটানো, খুন, সন্ত্রাস, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি নৈরাজ্য এই অঞ্চলে ছিল না। কিন্তু অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে যায় ঐ এলাকায় যৌথবাহিনী অভিযান শুরু করার পর। এখন যাত্রীদের একটা অন্তহীন আতঙ্ক নিয়ে ঐ অঞ্চল দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। কে কখন ট্রেন উড়িয়ে দেবে, বাসে বোমা ফেলবে, কে কাকে কখন রাস্তায় খুন করবে কোনও ঠিক- ঠিকানা নেই। অবস্থা এমন ভয়াবহ রূপ নিয়েছে যে, যে কেউ এই অবস্থার সুযোগ নিতে পারে এবং নাশকতা করতে পারে। আরও লক্ষণীয়, এমন একটা সময়ে এরকম সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হল যখন গোটা জঙ্গলমহল কেন্দ্র-রাজ্য যৌথবাহিনীর কব্জায় এবং তাদের আশ্রয়ে এলাকায় সিপিএম হার্মাদদের দাপাদাপি। সামরিক বাহিনীর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকায় সেখানে বিরোধী দলের কাজকর্মও বন্ধ, জনগণের কমিটির নেতারা কেউ জেলে বন্দী, কেউ নিহত, কেউ বা এলাকাছাড়া। এই অবস্থায় মাওবাদীরাই হোক বা মাওবাদীদের নামে যে কেউই হোক যা খুশি করে পার পেয়ে যেতে পারে।

যখন জনগণের কমিটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অত্যাচারী পুলিশের শাস্তি ও এলাকার উন্নয়নের দাবিতে আন্দোলন করছিল— মিছিল, মিটিং, ডেপুটেশন, অবরোধ ইত্যাদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আট মাস ধরে আন্দোলন চালিয়েছিল, তখন কোনও নাশকতামূলক ঘটনা ঘটেনি। হাটবাজার, স্কুল, সরকারি অফিসের কাজকর্ম সবই যথারীতি চলেছে। নাশকতামূলক কাজকর্ম ঘটতে শুরু করে যৌথবাহিনী হানা দেওয়ার পর।

জঙ্গলমহলের সমস্যা মেটানোর জন্য কি যৌথ সামরিক হানার প্রয়োজন ছিল? জনগণের কমিটি আন্দোলনের দাবিগুলি সবসময়ে আলাপ-আলোচনার পথেই মেটাতে চেয়েছে। কমিটির নেতা ছত্রধর মাহাতোর সঙ্গে প্রশাসনের অনেকবার বৈঠক হয়েছে। খোদ দলিলপুরচকে, জনগণের কমিটির জনসভায় বিডিও ভাষণ দিয়েছেন, পশ্চিম মেদিনীপুরের তদানীন্তন অতিরিক্ত জেলাশাসক মিঃ ইজরায়েল ছত্রধর মাহাতোর সঙ্গে বৈঠক করেছেন ছোটপেলিয়া গ্রামে। সরকার দফায় দফায় কমিটির সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেছে। সর্বশেষ ১৩ জুন ২০০৯ মেদিনীপুর সার্কিট হাউসে জনসাধারণের কমিটির সঙ্গে তৎকালীন স্বরাষ্ট্র সচিব অর্ধেন্দু সেনের বৈঠক হয়েছে। সেখানে ছত্রধর মাহাতো স্বরাষ্ট্র সচিবকে অবরোধ তোলার চার দফা শর্তও দেন। আলোচনা সন্তোষজনক হয়েছে বলে উভয়পক্ষ ঘোষণা করেন। পরবর্তী আলোচনার দিন ঠিক হয় ১৪ জুলাই। কিন্তু ১৪ জুলাই পর্যন্ত সিপিএম সরকার অপেক্ষা করল না। ১৩ জুনের মিটিং-এর ২/৩ দিন পর হঠাৎ সি পি এম সরকার বলতে শুরু করল মাওবাদীরাই লালগড়ের দখল নিয়ে বসেছে। মাওবাদী কব্জা থেকে লালগড়কে মুক্ত করতে হবে, এই আওয়াজ তুলে কেন্দ্রের কংগ্রেস ও রাজ্যের সিপিএমের মধ্যে বোঝাপড়া হয়ে যায়। কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথবাহিনী ১৮ জুন ২০০৯ সামরিক অভিযান চালায়। তারপর যৌথবাহিনীর অত্যাচারের কাহিনী সকলেরই জানা।

কেন সরকার লালগড় সমস্যা মেটানোর জন্য গণতান্ত্রিক পথ বন্ধ করে দিল? আলাপ আলোচনার পথ না নিয়ে যৌথ সামরিক হানার পেছনে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কী রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি রয়েছে, সেটি একটি ভিন্ন আলোচনা। কিন্তু তাদের এই দুরভিসন্ধির ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে দুষ্কৃতীরা নাশকতা চালিয়ে যাচ্ছে, বিপন্ন হচ্ছে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা। তাদের দুষ্ট রাজনীতির বলি হচ্ছে সাধারণ মানুষ। এভাবে, মাওবাদীরাই হোক বা অন্য যে কোনও শক্তিই হোক — যারাই এই জঘন্য অপরাধ করল, তাদের এ ধরনের নাশকতা চালাবার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে দেওয়ার দায় রাজ্যের সিপিএম ও কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারকেই নিতে হবে।

‘লালগড়ের আন্দোলন আবার মাথা তুলবেই’

জনগণের কমিটির কেন্দ্রীয় নেতা সদ্য জেলমুক্ত কমরেড বিবেকানন্দ সাউ

লালগড়ের আদিবাসী ও গরিব মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম নেতা পুলিশি সন্ত্রাসবিরোধী জনগণের কমিটির কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্য কমরেড বিবেকানন্দ সাউ দীর্ঘ ১১ মাস পর গত ২৭ জুন জামিনে জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন। লালগড় আন্দোলন, মাওবাদী ধুয়া, যৌথবাহিনীর ভূমিকা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গত ৩ জুন কলকাতায় গণদাবীর দপ্তরে তাঁর নিম্নলিখিত সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হয়। — সম্পাদক, গণদাবী।

প্রশ্ন ঃ কমরেড বিবেকানন্দ, কবে এবং ঠিক কোন জায়গা থেকে পুলিশ আপনাকে গ্রেপ্তার করেছিল?

উত্তর ঃ যৌথবাহিনী এসে কীভাবে মানুষের উপর অত্যাচার করছে, নিরীহ মানুষদের গ্রেপ্তার করছে, বিভিন্ন জায়গায় ঘরবাড়ি ভাঙচুর করেছে, এমনকী পানীয় জল দূষিত করেছে, এই বিষয়গুলি নিয়ে বিক্ষোভ দেখাবার জন্য ছেলেমেয়ে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলকে নিয়ে আমরা জনসাধারণের কমিটির নেতৃত্বে গত বছর ২৮ জুলাই লালগড় যাচ্ছিলাম। ঐ সময়ই আমাকে রাস্তা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

প্রশ্ন ঃ কোন এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়?

উত্তর ঃ যে জায়গায় থাকি সেটা মেদিনীপুর সদর ব্লকের একেবারে শেষপ্রান্তে ধেড়ুয়া অঞ্চল। এর পর থেকেই লালগড় ব্লক শুরু। আমাকে ধরেছে ধরমপুর বলে একটা জায়গা থেকে।

প্রশ্ন ঃ পুলিশি সন্ত্রাসবিরোধী জনসাধারণের কমিটি নামে যে গণকমিটি গড়ে উঠেছিল, আপনি কি তার সদস্য ছিলেন?

উত্তর ঃ আমি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলাম। জনসাধারণের কমিটির ন্যায্য আন্দোলনকে আমাদের দল প্রথম থেকেই সমর্থন করেছে। আমি আন্দোলনের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে যুক্ত হই।

প্র ঃ কেন্দ্রীয় কমিটি কতজনের ছিল?

উ ঃ বিভিন্ন এলাকার প্রতিনিধি নিয়ে ৩৪ জনের কমিটি ছিল, পরে ৩৫ জন হয়।

প্র ঃ স্তরে স্তরে কি কমিটি ছিল?

উ ঃ কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে অঞ্চল কমিটি, ব্লক কমিটি এবং গ্রাম কমিটিও ছিল।

প্র ঃ আপনি জেল থেকে ছাড়া পেলেন কবে?

উ ঃ আমি ছাড়া পেলাম ২৭ জুন, ২০১০। ১১ মাস জেলে ছিলাম।

প্র ঃ আপনার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ আনা হয়েছিল?

উ ঃ সরকারি কাজে বাধা, অগ্নিসংযোগ, লুঠতরাজ, এমনকী দু'জনকে খুন করার অভিযোগও দেওয়া হয়।

প্র ঃ আমরা শুনেছি, একটা মামলায় জামিন হলেই আপনার বিরুদ্ধে অন্য অভিযোগ এনে বন্দি রাখা হয়েছিল।

উ ঃ একটা মামলায় জামিন পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হলেই আর একটা মিথ্যা মামলা দিয়ে দেওয়া হত। এখনও আমার বিরুদ্ধে অন্য মামলা ঝুলছে।

প্র ঃ লালগড় আন্দোলনের পটভূমিটা কী? হঠাৎ কি মানুষ গণবিক্ষোভে ফেটে পড়ল?

উ ঃ ঐ সব অঞ্চলের আদিবাসী ও অন্যান্য গরিব মানুষের জীবনের চরম দুর্দশা না দেখলে বোঝা যায় না। ঘরে ঘরে বেকার, কাজ নেই, ১০০ দিনের কাজও তার পায় না। শিক্ষা নেই, হাসপাতাল নেই, রেশনে চাল-গম জোটে না। রাস্তা-ঘাট খারাপ। ওদের দুঃখের জীবন দেখলে নিজেকে স্থির রাখা মুস্কিল। ২০০৮ সালের নভেম্বরে শালবনি থেকে ফেরার পথে মেদিনীপুরের কাছে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কনভয়ে হঠাৎ ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণ ঘটে যায়। কারা কীভাবে ওখানে ল্যান্ডমাইন রাখল, মাইন ফাটল অথচ কারও তেমন গুরুতর আঘাত কিছু ঘটল না, এ সব প্রশ্নের উত্তর আজও পাওয়া যায়নি। এই ঘটনাকে দেখিয়েই পুলিশ ‘মাওবাদী’ ধরার অভিযানে নামে। আদিবাসী আন্দোলনের মূল কেন্দ্র ছোটপেলিয়ায় ৩ ও ৪ নভেম্বর রাতে পুলিশ অভিযান চালায়। সীতামণি মুর্মু নামে এক মহিলার চোখ নষ্ট করে দেয়, আরও অনেকের উপর অত্যাচার করে। বেশ কয়েকজনকে মারধর করে, কয়েকজনের হাত ভেঙে দেয়। কাঁটাপাহাড়ি বলে একটা জায়গায় একজনকে ধরতে যাওয়ার নাম করে তাঁর গর্ভবতী স্ত্রীকে লাথি মেরে সন্তান নষ্ট করে দেয়। মানুষের মধ্যে যে ক্ষোভ ছিল এই ঘটনায় তার বিস্ফোরণ ঘটে। মানুষ আন্দোলনে নামে। প্রথমদিকে খুবই অল্প কয়েকজন আন্দোলন শুরু করে। ঝাড়খণ্ড পার্টি ও তৃণমূল কংগ্রেস সঠিক ভূমিকা না নেওয়ায় মানুষ তাদের উপর নির্ভর না করে ঐক্যবদ্ধভাবে জনসাধারণের কমিটি গঠন করে। আদিবাসীদের যে সামাজিক সংগঠন ‘ভারত জাকাত মাঝি মাড়োয়া’, তারাও এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে এসেছিল। সিপিএমের প্রভাবিত মাঝি মাড়োয়া সংগঠন যখন আপসমুখী হয়ে দাবি আদায় ছাড়াই আন্দোলন গুটিয়ে নিতে চাইল, তখনই সাধারণ মানুষ জনসাধারণের কমিটিকে আরও শক্তিশালী করল।

প্র ঃ ছোটপেলিয়া বিস্ফোরণ স্থল থেকে কত দূরে?

উ ঃ বিস্ফোরণস্থল থেকে প্রায় ৪০-৪২ কিলোমিটার দূরে।

প্র ঃ পুলিশ এতদূরের ঐ জায়গাটাকে টার্গেট করল কেন?

উ ঃ পুলিশের অভিযোগ ছিল ঐ বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে ‘মাওবাদীরা’ এবং তারা নাকি ছোটপেলিয়া গ্রামে ডেরা বেঁধেছে। অথচ যে কলাইচণ্ডী গ্রামের কাছে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ে বিস্ফোরণ হয়েছিল, সেই গ্রামটি ছিল পুরোপুরি সিপিএম প্রভাবিত, পঞ্চায়েতও তাদের।

প্র ঃ যৌথবাহিনী নামে ১৮ জুন,২০০৯ আর আপনাকে গ্রেপ্তার করা হয় ২৮ জুলাই। একমাসেরও বেশি সময় ধরে যৌথবাহিনীর অভিযান আপনি দেখেছেন। আপনার অভিজ্ঞতা কী?

উ ঃ যৌথবাহিনী নামার আগে ঐ অঞ্চলে কোনও খুন-খারাপি হয়নি। যৌথবাহিনী আসার পর রাজনৈতিক খুন শুরু হয়। প্রথম খুনের কেসটাতেই আমাকে জড়িয়ে দেওয়া হয়। বিভিন্ন জায়গায় বাড়ি ভাঙচুর করা হয়। যৌথবাহিনী আইনশৃঙ্খলা রক্ষার পরিবর্তে নিজেরাই আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গ করছে। তারা স্কুল দখল করেছে। গ্রামে এসে মহিলাদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করেছে—এ অভিযোগ মহিলারাই করেছেন। যে সমস্ত গ্রামে ঢুকেছে তাতে ব্যাপক অত্যাচার করেছে, হাঁস-মুরগি লুঠ করেছে, এ ছাড়া শারীরিক অত্যাচার বা নিগ্রহ হয়েছে।

প্র ঃ প্রথমদিকে জনসাধারণের কমিটির আন্দোলনে কি কোনও পুলিশ আহত হয়েছিল?

উ ঃ না। যৌথবাহিনী নামার আগে পুলিশের সাথে মারামারি গন্ডগোল প্রায় ঘটেনি। যৌথবাহিনী নামার আগে ধরমপুরে কিছুটা গণ্ডগোল হয়েছিল, তেমন কিছু নয়। অবরোধ হয়েছে, জনগণ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেছে, নন্দীগ্রামের আন্দোলন অনুসরণ করে রাস্তা কেটে পুলিশ ঢুকতে বাধা দিয়ে দাবি পেশ করেছে। এগুলি তো গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অঙ্গ। তখন জনজীবন স্বাভাবিক ছিল। বিডিও দপ্তর খোলা ছিল। স্কুল চলেছে। মানুষ নির্ভয়ে পথে নেমেছে। যৌথবাহিনী নামানোর পর পরিস্থিতি পাল্টে গেল।

গণদাবী দপ্তরে কমরেড বিবেকানন্দ সাউ ও কমরেড স্বপন পাত্র (বাঁদিক থেকে দ্বিতীয় ও তৃতীয়)

প্র ঃ জনসাধারণের কমিটির নেতা হিসেবে যে দু'জন ছিলেন—ছত্রধর মাহাতো ও লালমোহন টুডু। তাঁদের সরকার ‘মাওবাদী’ আখ্যা দিয়েছে। এটা কি ঠিক?

উ ঃ প্রশাসন ভাল করেই জানে ছত্রধর মাহাতোর সাথে মাওবাদীদের কোনও যোগ নেই। জঙ্গলমহলের দাবিদাওয়া নিয়ে তাঁরা যখন প্রশাসনের সাথে বৈঠক করেছেন, এমনকী নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন, তখন তো তাঁদের মাওবাদী বলা হয়নি। জেলের মধ্যেও তাঁর সাথে কথাবার্তায় আমার মনে হয়নি যে তিনি তথাকথিত মাওবাদীদের সমর্থন করেন।

প্র ঃ জনসাধারণের কমিটির কোনও নির্দিষ্ট দলীয় রাজনৈতিক চরিত্র কি ছিল না?

উ ঃ আসলে জনসাধারণের কমিটির আন্দোলনে জনসাধারণের কমিটিই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজনৈতিক দলের প্রস্তাব মতামত শোনা হয়েছে, কিন্তু বিচার করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিটির সদস্যরাই। আন্দোলনের কর্মসূচিতে কোনও রাজনৈতিক দলের ঝান্ডা বা ব্যানার রাখা হয়নি। নন্দীগ্রামেও ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি অনেকটা এভাবেই কাজ করেছিল।

প্র ঃ এই আন্দোলনকে ‘মাওবাদী আন্দোলন’ বলা হল কেন?

‘মাওবাদী’ স্ট্যাম্প লাগালে আন্দোলন দমনে প্রশাসন যুক্তি খাড়া করতে পারছে। যে সমস্ত দাবিদাওয়া নিয়ে জনসাধারণের কমিটি গড়ে উঠেছিল, সেগুলি সরকারের অনেক আগেই মেটানো দরকার ছিল। ছত্রধর মাহাতো এই দাবিগুলি সরকারের কাছে রেখেছেন, এতে তাঁকে তো সরকারের সহায়ক হিসেবেই ভাবা উচিত ছিল। যে সমস্ত দাবিদাওয়া তিনি রেখেছেন, কোনওটাই তো অগণতান্ত্রিক নয়। অনুন্নয়ন এবং পুলিশি অত্যাচারের মধ্যে মানুষকে ফেলে রাখবে—আর মানুষ গরিব বলে চিরদিন মুখ বুঁজে মার খাবে, এটা ধরে নেওয়া ঠিক নয়। এগুলির বিরুদ্ধে মানুষ যখন জেগে উঠল তখনই আন্দোলনকে ভাঙতে ‘মাওবাদী’ তকমা দেওয়া হল।

প্র ঃ আপনাকে কি কখনও পুলিশ ‘মাওবাদী’ বলে আখ্যা দিয়েছে?

উ ঃ পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের সময় বার বার জানতে চেয়েছে কোন কোন ‘মাওবাদী’ নেতাকে আমি চিনি, কোন কোন নেতা জনসভায় ছিলেন। আমি বলেছি, সমস্ত আন্দোলনেই আমরা অংশগ্রহণ করেছি, কমিটির জনসভাতেই আমাদের দলের নেতারা ভাষণ দিয়েছেন, তার ছবিও আছে। কলকাতা থেকে যে সমস্ত বিশিষ্ট মানুষ গিয়েছেন তাঁরা বক্তব্য রেখেছেন। জনসাধারণের কমিটির নেতারা সমস্যা নিয়ে এস ইউ সি আই (সি) দলের নেতাদের সাথে পরামর্শ করেছেন। পুলিশ ভাল করেই জানে এই আন্দোলনটা যেভাবে চলেছে তাতে ‘মাওবাদী’দের সাথে যোগাযোগ থাকার প্রশ্নই ওঠে না।

প্র ঃ আপনি বলছেন সরকার বিলক্ষণ জানত জনসাধারণের কমিটি মাওবাদীদের কোনও সংগঠন ছিল না।

উ ঃ সকলেই জানত। জনসাধারণের কমিটির কোনও স্বকীয় ভূমিকা বা অস্তিত্ব ছিল না, মাওবাদীরাই জনসাধারণের কমিটিকে নেতৃত্ব দিচ্ছে, বা মাওবাদীদেরই কোনও সংগঠন হিসাবে তারা কাজ করছিল— এ ধারণাটা যে ঠিক নয়, এটা প্রশাসন অত্যন্ত ভাল করেই জানত।

প্র ঃ তা হলে কি শাসকদল এবং সরকার উদ্দেশ্যমূলকভাবেই এই প্রচারটা তুলেছিল?

উ ঃ শাসকদল ও প্রশাসন জানে যে জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত এই আন্দোলন দমন করতে হলে বা তার উপর পুলিশি অত্যাচার নামিয়ে আনতে হলে তার গায়ে ‘মাওবাদী’ ছাপ লাগালে তাদের অনেক সুবিধা হবে। তাই তারা ইচ্ছাকৃতভাবেই এই ছাপটা দিয়েছে।

প্রথমে জনসাধারণের দাবি ছিল, পুলিশ সুপার রাজেশ সিংকে ক্ষমা চাইতে হবে। পুলিশ সেটা না চাওয়ায় আন্দোলন ক্রমাগত জোরদার হতে থাকে। সরকার দেখে যে, পুলিশ যদি দাবি মেনে নেয় তবে আন্দোলনটাই জয়যুক্ত হবে, তার ফলে আন্দোলন আরও শক্তিশালী হবে। নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুরের পর লালগড়ের বঞ্চিত আদিবাসী মানুষ তাঁদের জীবনের ন্যূনতম সুযোগ সুবিধার দাবিতে যে আন্দোলন গড়ে তুলছে, তা যদি জয়যুক্ত হয় তবে গোটা দেশের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়বে এবং দেশজুড়ে গণআন্দোলনের আর একটা নজির তৈরি করবে। তাই সরকার এই আন্দোলনের গায়ে মাওবাদী তকমা লাগিয়ে তাকে দমন করার কৌশল নিল। এবং দুঃখের কথা, গুটিকয়েক তথাকথিত ‘মাওবাদী’ ব্যক্তি তাদের ভূমিকার দ্বারা এ ব্যাপারে, জেনে বা না জেনে সরকারকেই সহায়তা করল।

প্র ঃ মাওবাদীরা তো জঙ্গলমহলে রয়েছে। তারা একেবারে নেই, ব্যাপারটা তো এমন নয়। তা হলে তারা কীভাবে রয়েছে? কী তাদের কর্মকাণ্ড?

উ ঃ অতীতে সিপিএম করতেন কিন্তু দলের সঙ্গে নানা কারণে বিরোধের জন্য দল ছেড়েছেন এমন কিছু ব্যক্তি পি ডব্লু জির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁরাই ‘মাওবাদী’ হন। সংখ্যাটা এমন কিছু নয়। আমার যতদূর জানা আছে তাতে গুটিকয়েক মানুষই এদের সাথে যুক্ত ছিলেন।

চারের পাতায় দেখুন

তিনের পাতার পর

জঙ্গলমহলে মাওবাদীদের যে ব্যাপক প্রভাবের কথা বলা হচ্ছে, মাওবাদীদের সাথে জনগণের কমিটিকে না গুলিয়ে ফেললে, মাওবাদীদের সে রকম কোনও প্রভাব জঙ্গলমহলে ছিল না। এখন তো প্রশাসনের পক্ষ থেকেই মাওবাদীদের জুজু হিসাবে দেখানো হচ্ছে, বিরাট করে দেখানো হচ্ছে। মাওবাদীরাও প্রশাসনের এই ফাঁদে পা দিচ্ছে, এবং নিজেদের একটা বিশাল শক্তি হিসাবে ভাবছে। আসলে আমরা যারা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত তারাই জনগণকে নিয়ে এই আন্দোলনটাকে গড়ে তুলেছি, অথচ সরকার এটাকে 'মাওবাদী' আন্দোলন হিসাবে দেখাচ্ছে, যাতে আন্দোলনটাকে দমন করা যায়।

প্রঃ লালমোহন টুডুকে বলা হচ্ছে মাওবাদীদের নেতা। তাঁর সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?

উঃ প্রয়াত লালমোহন টুডু ছিলেন একজন নিপাট সজ্জন ব্যক্তি। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা। প্রথমে সিপিএম করতেন। তারপর ঝাড়খণ্ড আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন। তারপর জনসাধারণের কমিটির আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি শিক্ষিত মানুষ। এলাকায় অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়। সে জন্যই সর্বজনগ্রাহ্য নেতা হিসাবে তিনি কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। জনগণের কমিটি যে দাবিগুলি নিয়ে আন্দোলন করছে, সেগুলি ন্যায্য মনে করেই তিনি এই আন্দোলনে যুক্ত হন। তাঁকে পুলিশ ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করেছে। সংঘর্ষের ব্যাপারটা প্রশাসনের বানানো। আমাদের দলও এ কথা স্পষ্টভাবে প্রথম দিনই বিবৃতি দিয়ে বলেছিল। আমি জেলে থেকেই তা শুনেছি।

প্রঃ তা হলে আপনি বলছেন লালমোহন টুডুর রাজনৈতিক মতবাদের সাথে 'মাওবাদী'দের কোনও সম্পর্ক নেই?

উঃ না, কোনও সম্পর্ক নেই।

প্রঃ আপনি কোন জেলে ছিলেন? সেখানে 'মাওবাদী' হিসাবে গ্রেফতার হওয়া কতজন রয়েছেন?

উঃ প্রথমে ছিলাম ঝাড়গ্রাম জেলে। পরে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে। সেখানে দশ মাস ছিলাম। আমি যতদিন জেলে ছিলাম, দেখেছি, প্রায় ১২০০ মানুষকে মাওবাদী হিসাবে গ্রেফতার করে বন্দি করা হয়েছে।

প্রঃ এই ১২০০-জনের মধ্যে কতজন 'মাওবাদী'র দেখা পেয়েছেন আপনি?

উঃ মাওবাদী হিসাবে যাঁরা গ্রেফতার হয়ে জেলে এসেছেন, তাঁদের অধিকাংশের সঙ্গেই আমি কথা বলেছি। মাওবাদী তো দূরের কথা, রাজনৈতিক কোনও কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত এমন মানুষই একেবারে হাতে গোনা। মাওবাদীদের গণসংগঠনের সঙ্গে যুক্ত এমন দু-তিন জন জেলার বাইরের ব্যক্তি ছিলেন। বাদবাকি ছিলেন জঙ্গল মহলের নিরীহ সাধারণ মানুষ। এরা ঐ বাইরের দু-একজন যে মাওবাদী ছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগের সুরে বলতেন, আমাদের এত বড় আন্দোলনের তোমরা ক্ষতি করে দিলে।

প্রঃ আর কারা 'মাওবাদী' হিসাবে গ্রেফতার হয়েছিলেন?

উঃ সিপিএম ছেড়েছেন এমন মানুষরাও জেলে ছিলেন। আমার গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য, যিনি সিপিএম ছেড়েছেন, তিনিও একই অভিযোগে তিন মাস জেল খেটেছেন। লোধাগুলি বলে একটি এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির সিপিএম সদস্য, তিনিও দল ছেড়েছেন বলে 'মাওবাদী' অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। যেহেতু এঁরা সিপিএম দল ছেড়েছেন, তাই এঁদের গায়েও 'মাওবাদী' তকমা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রঃ আপনার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ কি পুলিশ প্রমাণ করতে পেরেছে?

উঃ না। সরকারি কাজে বাধাদান অর্থে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনেছিল, প্রমাণ করতে পারেনি। এমনকী পুলিশ ছাড়া অন্য কোনও সাক্ষীও

কমরেড বিবেকানন্দ সাউয়ের সাক্ষাৎকার

তারা জোগাড় করতে পারেনি। পুলিশ যাদের সাক্ষী বলে নাম দিয়েছিল, তাদের নাকি খুঁজে পায়নি। অথচ তারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। বলেছে, পুলিশ আমাদের সাদা কাগজে সই করিয়ে নিয়েছে। কারও বাবা মারা গেছে, আত্মীয় মারা গেছে, মৃতদেহ নেওয়ার সময় সাদা কাগজ দিয়ে পুলিশ বলেছে, এখানে সই করতে হবে। তাদের সেই সই জাল করে অন্যত্র বসিয়ে সাক্ষী বলে ঘোষণা করেছে।

প্রঃ এস ইউ সি আই (সি)-র একজন সংগঠক হয়ে আপনি আন্দোলনের একজন নেতা হলেন কীভাবে? সকলেই কি জানত যে, আপনি এস ইউ সি আই (সি) করেন?

উঃ অবশ্যই জানত। দলের সিদ্ধান্ত ও নীতি অনুযায়ীই আমরা এই আন্দোলনে অংশ নিয়েছি। বিভিন্ন জনসভাতেও আমাদের দলের নেতারা বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু সবসময়ই তাঁরা কমিটির নেতৃত্বে আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য বলেছেন। নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুরেও আমাদের দল এই নীতি নিয়েই চলেছে। আমরা চাইনি কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দলের নামে এই আন্দোলন পরিচিত হোক, সব সময় আন্দোলনের গণচরিত্র রক্ষা করেছি। আমিও কলকাতায় এসে টিভি চ্যানেলে কমিটির পক্ষ থেকে বক্তব্য রেখে গেছি।

প্রঃ কমিটিই কি আপনাকে পাঠিয়েছিল?

উঃ হ্যাঁ, কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েই আমাকে পাঠিয়েছিল। তা ছাড়া কলকাতায় কমিটির পক্ষ থেকে যে মিছিল করা হয়েছিল, সেখানেও আমাদের দলের রাজ্য কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রঃ মাওবাদী প্রতিপন্ন করার জন্য পুলিশ কী ধরনের প্রমাণ হাজির করছে?

উঃ ছত্রধর মাহাতোকে যে চার্জশিট দিয়েছে, সেটা আমি দেখেছি। এ ছাড়াও যে তিনজনকে ইউ এ পি এ দেওয়া হয়েছে, তাঁরা একেবারে নিরীহ গরিব মানুষ। তাঁদের মধ্যে একজন মাঠে ঘাস কাটছিলেন — তাঁর নাম লালু সরেন, ভাল নাম শম্ভু। আর একজন রণজিৎ মুর্মু। আর একটি ছেলে সাধন মুর্মু। এঁরা তিনজনেই সাধারণ মানুষ, কোনও রাজনীতির সাথে এঁদের যোগ নেই। পুলিশ বলেছে, এঁদের কাছে নাকি ল্যান্ডমাইন পাওয়া গেছে এবং তাঁরা নাকি এ কথাও বলেছে যে, ছত্রধর মাহাতো একটি মিটিং করার সময় পুলিশ ঘিরে ফেললে অন্যরা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পালিয়ে যায় এবং ছত্রধর মাহাতোকে পুলিশ ধরে ফেলে। অথচ সংবাদমাধ্যম সহ সকলেই জানে কীভাবে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের সময় পুলিশ সাংবাদিকের ছদ্মবেশে তাঁকে গ্রেফতার করে। ছত্রধর মাহাতোকে যে সিজার লিস্টে স্বাক্ষর করানো হয় তাতে লেখা হয় 'নিল', অর্থাৎ কিছু পাওয়া যায়নি। পরে সেই 'নিল' শব্দটি কেটে করা হয়েছে ডবল ব্যারেল রাইফেল। চার্জশিট দেখলে যে কেউ এটা ধরতে পারবেন। আমাদের সকলের ক্ষেত্রেই যা ঘটেছে ছত্রধর মাহাতোর ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। যেমন, আমার ডাক্তারি পরীক্ষার রিপোর্টে হয়ত সই করেছি, সেই সইয়ের জেরক্স করে সিজার লিস্টে বসানো হয়েছে। এ ছাড়াও কিছু ছবি দেওয়া হয়েছে যার সঙ্গে ছত্রধর মাহাতোর কোনও সম্পর্ক নেই। কিছু কমিটির জনসভার ছবি, কোথাও হয়ত একটা ল্যান্ডমাইনের ছবি, একটা তারের ছবি। আর মাওবাদীদের ম্যানিফেস্টোর একটা পাতার কপি। সিজার লিস্টের কোনও সাক্ষীও নেই। সিপিএমের লালগড় এলাকার কিছু নেতার নাম সাক্ষী হিসাবে আছে। লালগড় এলাকায় 'মাওবাদী' নাম দিয়ে যত কেস হয়েছে, এই নেতারা সব কেসেরই সাক্ষী। বয়ানও একই রকম— তাঁরা থানার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন ছত্রধর মাহাতো বা অন্যদের স্বীকারোক্তি তাঁরা শুনেছেন। এই হচ্ছে সাক্ষ্যের বয়ান। এ ছাড়া অন্য কোনও সাক্ষী নেই।

প্রঃ জঙ্গলমহলের মানুষ যৌথবাহিনীর এই অভিযানকে কী চোখে দেখছে?

উঃ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের পুলিশ গ্রেফতার করে অত্যাচার করেছে, সিগারেটের ছ্যাঁকা দিয়েছে, পুরুষাঙ্গে লঙ্কার গুঁড়ো ছিটিয়ে দিয়েছে, পিছনে পুলিশের রুল ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, একটা গোটা আদিবাসী গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। যখন সর্বস্ব হারানো সেই মানুষগুলির পাশে দাঁড়ানোর জন্য, সামান্য খাবার পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমাদের দলের কর্মীরা গিয়েছেন তখন পুলিশ তাঁদেরও গ্রেফতার করেছে। নিরীহ মানুষকে ধরে মেরে হাত-পা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। বেলপাহাড়ি থেকে দু'জন মহিলাকে ধরা হয়েছিল, তাঁদেরও মেরে হাত-পা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। পিড়াকাটা বাজারে পুলিশের হঠাৎ মনে হয়েছে মাওবাদীরা এসে গেছে, অমনি নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে। বেশ কয়েকজন সাধারণ মানুষ গুলিতে জখম হয়েছে। তাদের এমনকী হাসপাতালে চিকিৎসা পর্যন্ত করতে দেওয়া হয়নি। সেখান থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রথম থেকেই যৌথবাহিনী এই ব্যাপক অত্যাচার নামিয়ে এনেছে। ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া, ধানে-চালে মিশিয়ে দেওয়া, ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া, চালে কেরোসিন ঢেলে দেওয়া, কুয়োতে মলত্যাগ করা প্রভৃতি নানাভাবে অত্যাচার চালিয়েছে। এরপর মানুষ যৌথবাহিনীকে কী চোখে দেখতে পারে?

প্রঃ সিপিএমের ক্রিমিনালবাহিনীর ভূমিকা কী?

উঃ যৌথবাহিনীর অভিযান সিপিএম নেতৃত্বের পরিকল্পনা অনুযায়ীই হচ্ছে। সিপিএম কোনও একটা এলাকা নির্দিষ্ট করে দিলে যৌথবাহিনী অভিযান চালাচ্ছে। ব্যাপক ধরপাকড় ও মারধর করছে। ফলে একটা আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। বাকি মানুষ গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে। সেই সুযোগে সিপিএমের ক্রিমিনালবাহিনী এলাকা দখল করছে। এরপর সেখানকার মানুষের উপর এই বাহিনী অত্যাচার চালাচ্ছে, শাসানি দিচ্ছে। এখান থেকেই পাশের এলাকায় কোনও একটা ঘটনা ঘটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যেমন কউকে খুন করে দেওয়া হচ্ছে, বা মাইন বিস্ফোরণ ঘটানো হচ্ছে, বা পুলিশের উপর আক্রমণ চালানো হচ্ছে। তাকে অজুহাত করেই এবার যৌথবাহিনী অভিযান চালাচ্ছে এবং একইভাবে সিপিএম এলাকার দখল নিচ্ছে।

যে সমস্ত এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে, সেখানে অন্য কোনও রাজনৈতিক দল মিটিং-মিছিল করতে পারছে না, কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি নিতে পারছে না, এমনকী যেখানে মাসের পর মাস যৌথবাহিনী স্কুল দখল করে রেখেছে, সেখানে আমাদের দলের ছাত্র সংগঠন ডি এস ও-র পক্ষ থেকে স্কুল চালুর দাবিতে মিছিল করলে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে, অথচ এই একই এলাকাতে সিপিএম বিনা বাধায় মিছিল করছে। এভাবে যৌথবাহিনী সিপিএমকে তার হারানো এলাকা দখল করে দেওয়ার কাজেই সর্বতোভাবে সাহায্য করছে।

প্রঃ প্রায়ই দু'জন তিন জন মানুষকে খুন করে রাস্তায় ফেলে রাখা হচ্ছে, বলা হচ্ছে এঁরা সিপিএম কর্মী। যদিও এমন নিহত ব্যক্তিও পাওয়া যাচ্ছে, যাঁরা জনসাধারণের কমিটির সঙ্গে যুক্ত। এটা কারা করছে?

উঃ এই প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষাৎকারে উপস্থিত দলের মেদিনীপুর গ্রামীণ কমিটির সম্পাদক কমরেড স্বপন পাত্র বলেন, এইসব খুন যেখানে ঘটছে, যৌথবাহিনীর ক্যাম্প তার খুব কাছেই, অথচ তারা টের পাচ্ছে না, তাদের গোয়েন্দা দপ্তরও বিস্ময়করভাবে ব্যর্থ হচ্ছে। যেটা বিশ্বাস করা যায় না। সিপিএমের লোকজনও 'মাওবাদী' সেজে খুন করছে, জঙ্গলে খুন করে দেহ প্রকাশ্য রাস্তায় পেলে রেখে আতঙ্ক তৈরি করা হচ্ছে। কিন্তু এই খুনগুলি দেখিয়েই বাহিনী আশপাশের গ্রামে অত্যাচার করছে।

প্রঃ জনসাধারণের কমিটি এখন কী অবস্থায় রয়েছে?

উঃ কমিটির অধিকাংশ নেতা ও কর্মী জেলে, অনেকেই নিহত, প্রায় ২০ জনকে পুলিশ 'নিখোঁজ' করে রেখেছে। ফলে কমিটির অবস্থা আগের জায়গায় নেই। কিন্তু আন্দোলন দমন করার জন্য যে নৃশংস অত্যাচার করা হয়েছে, জনগণ তা কোনও দিন ভুলতে পারবে না। ফলে ভবিষ্যতে আরও বেশি শক্তি ও সংহতি নিয়ে এই আন্দোলন আবার মাথা তুলবেই।

পুরনির্বাচনে জনমতের রায়

একের পাতার পর

উদ্যোগে ও ক্ষমতায় সংগঠিত হয়েছে। এই আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে দেশের মানুষের সমস্ত সমস্যার মূল কারণ পুঁজিবাদী এই ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা স্থাপন করার মূল বিপ্লবী লক্ষ্যের পরিপূরক করে। এই প্রক্রিয়াতেই এখানে তৈরি হয় লড়াই সংগ্রামের এক সামগ্রিক বাতাবরণ। অন্যদিকে '৯৮ সালে তৃণমূল কংগ্রেস গঠনের পর থেকে তারাও পার্লামেন্টারি রাজনীতির লক্ষ্যকে সামনে রেখে সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে মিছিল, মিটিং, ধরনা ইত্যাদি শুরু করে। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের ঐতিহাসিক আন্দোলনের পটভূমিকায় তাদের সঙ্গে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের, প্রথমে নিচের তলায় জোট হয়। নন্দীগ্রামে সিপিএমের ভয়াবহ আক্রমণ, গণহত্যা, গণধর্ষণ থেকে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) নেতৃত্ব বোঝেন যে, গণআন্দোলনের উপর সিপিএমের এই নৃশংসতা, যা অচিরেই সর্বত্র ঘটবে, তাকে প্রতিরোধ করতে হলে, ঐক্যবদ্ধ শক্তি দরকার। আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক ও নকশালপন্থীরা সাড়া না দেওয়ায়, তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে আন্দোলনের জোটকে রাজ্যস্তরে প্রসারিত করা হয়। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের বীর কৃষকদের লড়াই থেকে প্রেরণা নিয়ে গোটা রাজ্যের সংগ্রামী জনগণের প্রতিরোধের আকাঙ্ক্ষাকে ভাষা দিয়ে এই জোট জনমনে বিপুল আস্থা ও উদ্দীপনার তরঙ্গ সৃষ্টি করে। তারপর থেকেই একে একে আসতে থাকে নির্বাচনী সাফল্য। প্রথমে পঞ্চায়েত ভোট, তারপর লোকসভা ভোট এবং বর্তমানে পুরভোট। এই ভোট মূলত অত্যাচারী শাসকদের হঠানোর আকাঙ্ক্ষার ভোট — তাদের বিরুদ্ধে প্রবল ঘৃণারই বহিঃপ্রকাশ। সিপিএম ও কংগ্রেসের অপশাসনে অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষের পরিবর্তনকামী মন ভোটের বাক্সে যে প্রতিফলন ঘটিয়েছে, স্বাভাবিকভাবেই তা গিয়ে পড়েছে এ রাজ্যের বৃহত্তম বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে।

কোনও কোনও মহল থেকে বামফ্রন্টের এই পরাজয়কে দেখিয়ে উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রচার করার চেষ্টা চলছে যে, এটি বামপন্থার বিরুদ্ধে রায়। এই মিথ্যাচার নতুন নয়। কিন্তু যেকোনও রাজনীতি সচেতন মানুষ জানেন ও বলেন যে, সিপিএমের মধ্যে বামপন্থী আদর্শের লেশমাত্র নেই, তারা ক্ষমতায় বসে কংগ্রেস-বিজেপি'র সরকারের মতো দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের স্বার্থের সেবা করেছে। মানুষ ক্ষিপ্ত হয়েছে বামপন্থা পরিত্যাগকারী সিপিএমের এই অবাম পুঁজিপতি তোষণকারী নীতির বিরুদ্ধে, তাদের অপশাসনের বিরুদ্ধে। আর সেই জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে যথার্থ বামপন্থী আদর্শে লড়াই পরিচালনা করে চলেছে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দল। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বও বলেছেন, এই রায় বামপন্থার বিরুদ্ধে নয়, সিপিএমের বিরুদ্ধে। ফলে নির্বাচনী এই ফলাফল যথার্থ বামপন্থী ও সংগ্রামী আদর্শের পক্ষেও জনমতের রায় — একথা ভুললে চলবে না। এ জন্যই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) কেন্দ্র ও

আটের পাতায় দেখুন

পুঁজিবাদী সংকটে রাশিয়ার শ্রমজীবী জনগণ কেমন আছে

রাশিয়ার অর্থনৈতিক এই বিপর্যয় কীভাবে ঘটল?

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরে যে রাশিয়া হয়ে উঠেছিল সারা বিশ্বের বিস্ময় ও গর্ব, যে রুশ জনগণ শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, সংস্কৃতিতে অগ্রগতির শিখর ছুঁতে যাচ্ছিল, সেই রাশিয়া আজ পুঁজিবাদী দুনিয়ার অংশীদার হয়ে যখন তীব্র বেকারি, দারিদ্র, খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-চিকিৎসা ও সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে ন্যুব্জ, দিশেহারা, তখন তা দেখে গভীর বেদনা সৃষ্টি না হয়ে পারে না।

আজ স্মরণ না করে পারা যায় না সেই ১৯২৯-৩৩ সালের বিশ্বপুঁজিবাদী মহামন্দার দিনগুলোর কথা। সেদিন পুঁজিবাদী দুনিয়া প্রায় ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছিল, অথচ সেই সংকট সোভিয়েত রাশিয়াকে স্পর্শ করতে তো পারেইনি, বরঞ্চ এক অপরিমেয় শক্তিতে সে তার অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখে ছিল।

অথচ ২০০৮ সাল থেকে পুঁজিবাদী সংকট যখন প্রবল গতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হয়ে সমস্ত পুঁজিবাদী দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, আজকের রাশিয়া তার হাত থেকে পরিত্রাণ পেল না। এই কঠিন সত্যটি গোপন করতে ২০০৯ সালের গোড়ার দিকেও রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী পুটিন রাশিয়ার জনগণকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন যে, মন্দা তাদের দেশকে স্পর্শ করতেই পারবে না। কারণ বিদেশে তেল বিক্রি করে পাওয়া ডলার তাদের প্রচুর রয়েছে। অর্থাৎ রপ্তানি মার খেলেও ক্ষতি নেই, আর দেশের ভিতরে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে গচ্ছিত সম্পদও রয়েছে প্রচুর। কিন্তু সত্য চাপা দেওয়া গেল না। অল্প কয়েকটা দিন যেতে না যেতেই ২০০৯ এর এপ্রিল মাসে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে পড়লে পুটিনকে অর্থনৈতিক 'সংকট প্রতিরোধ' কর্মসূচি গ্রহণ করতেই হল। পুটিন প্রতিশ্রুতি দিলেন ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা ও জনগণের গচ্ছিত সম্পদ সুরক্ষায়ও তারা উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং রাশিয়ার মুদ্রা রুবলের সাথে ডলারের বিনিময় মূল্য যাতে কমে না যায়, ২০ হাজার কোটি ডলার ব্যয় করে তার ব্যবস্থাও করেছেন। কিন্তু বাস্তবে ঘটলো উল্টো। ২০০৯ সালের গোড়ায় ১ ডলারের মূল্য ছিল ২৮ রুবল, 'প্রতিরোধ ব্যবস্থা' নেওয়ার পরেও ২০০৯ সালের শেষার্ধে এসে বিনিময় মূল্য দাঁড়াল ৩৩ রুবলে। রাশিয়ার সবের ব্যাঙ্ক (Sberbank) এবং আলফা ব্যাঙ্ক চেয়ারম্যানরা সমস্বরে পুটিনের সাথে দ্বিমত পোষণ করে ঘোষণা করলেন যে, সরকারের ঐ ব্যবস্থাপনায় ব্যাঙ্ক শিল্পের সমস্যার কোন সুরাহাই হয়নি, বরঞ্চ ইত্যবসরে ডজন ডজন ব্যাঙ্ক লালবাতি জ্বালিয়ে বিদায় নিয়েছে। তাঁরা দেখালেন ব্যাঙ্ক শিল্পের প্রদত্ত ঋণের ১০ শতাংশেরও বেশি হল খেলাপি ঋণ। বাস্তবিক, গভীর সংকটে হাবুডুবু খাচ্ছে রুশ অর্থনীতি। ২০০৯ সালের ডিসেম্বরে রাশিয়ার সরকারের অর্থনৈতিক বিকাশ দপ্তর ঐ বছরের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর রিপোর্টে স্বীকার করল যে, দেশের বার্ষিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন হার হতাশাব্যঞ্জক। একথাও বলল যে, সাম্প্রতিক বিশ্ব মন্দায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির মধ্যে রাশিয়া অন্যতম। রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ মোট উৎপাদন (জি ডি পি) ৮.৫ শতাংশ কমে গিয়েছে, শিল্পোৎপাদন কমেছে ১১ শতাংশ এবং খুচরো ব্যবসা ও পুঁজিবিনিয়োগ যথাক্রমে ৫.৭ শতাংশ ও ১৭ শতাংশ হারে কমে গিয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে ৭.৫ শতাংশ হারে। বাজেট ঘাটতি ২০০৯ সালে যেখানে ছিল ৯ শতাংশ, তাদের হিসাব মতো ২০১০ সালে তা গিয়ে দাঁড়াবে ৬.৫ শতাংশে। অর্থাৎ অর্থনীতির অধোগতি বজায় থাকছে। অবশ্য অর্থমন্ত্রী মিখাইল কুদরিন আশ্বাস দিয়েছেন যে, ২০১২ সাল নাগাদ অর্থনীতি ২০০৮ সালের অবস্থায় পৌঁছুতে পারে। কিন্তু অর্থনীতি বিদরা অর্থমন্ত্রীর এই মন্তব্যের সাথে একমত নন। ইউরো মনিটর ইন্টারন্যাশনাল ২০০৯-এর সেপ্টেম্বরে তার এক প্রতিবেদনে এমন সম্ভাবনার কথাও বলেছে যে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে না পারলে ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারতও চীনের সমন্বয়ে গঠিত অর্থনৈতিক জোট বি আর আই সি থেকে রাশিয়া বাদ যেতে পারে।

পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে অর্থনীতিকে একক পণ্য উৎপাদনের (সিঙ্গল প্রোডাক্ট ইকনমি) পথে নিয়ে যাওয়ার ফলে ২০০২-০৮ সাল পর্যন্ত তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানি করে রাশিয়া মজুদ সোনা ও মুদ্রায় ৬০ হাজার কোটি ডলারেরও বেশি সম্পদ সঞ্চয় করেছিল। রাশিয়ার ধনকুবের গোষ্ঠী ও উচ্চ আয়ের মানুষরা তখন ফেঁপে-ফুলে ওঠে। কিন্তু মন্দার বাজারে তেলের দাম ব্যারেল প্রতি যখন ১৪৯ ডলার থেকে ৫০/৬০ ডলার কমে গেল এবং বিশ্ববাজারে তেলের চাহিদাও গেল কমে, রাশিয়ার গচ্ছিত সম্পদ তখন কমে দাঁড়াল প্রায় ২০ হাজার কোটি ডলারে। অপরদিকে রাশিয়ার পুঁজিপতিরা তাদের আন্তর্জাতিক বাজারে অর্জিত ডলার তো বটেই, এমনকী রাশিয়ার ব্যাঙ্কগুলি ও সরকার পর্যন্ত তাদের সঞ্চিত মুদ্রা বিদেশি ব্যাঙ্কে, বিশেষ করে আমেরিকার ব্যাঙ্কে অধিকতর নিরাপত্তা ও বেশি আয়ের লোভে জমা রাখে। এবারের আর্থিক সংকট ফেটে পড়ার পূর্বে আমেরিকার ব্যাঙ্ক ও বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের সঞ্চিত ডলারের পরিমাণে রাশিয়া ছিল সপ্তম। মার্কিন ব্যাঙ্কগুলোতে যখন লালাবাতি জ্বলল, জমানো অর্থও উবে গেল। আর একটা বিষয়ও লক্ষণীয় যে, রাশিয়ার বহু কোম্পানিকে বিদেশি ঋণদাতাদের কাছ থেকে উচ্চ সুদের হারে অর্থ সংগ্রহ করতে হয়েছে। রাশিয়ার ব্যাঙ্ক ও শিল্পপতি গোষ্ঠীর এই ঋণের পরিমাণ প্রায় ৫৫ হাজার কোটি ডলার, অর্থাৎ রাষ্ট্রের সঞ্চিত বিদেশি মুদ্রার প্রায় সমপরিমাণ।

কিন্তু এটুকু দ্বারাই রাশিয়ার অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণ বোঝা যাবে না। একথা ঠিক যে, পুঁজির ধর্ম হচ্ছে যেখানে মুনাফার সম্ভাবনা বেশি ও ঝুঁকি কম, বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসাবে পুঁজি সেখানেই ছোটে। একই নিয়মে বিশ্বায়নের 'মুক্ত বাজারে' যে দেশে যে পণ্য উৎপাদন করা অধিকতর লাভজনক, সে দেশে সেই পণ্য উৎপাদনই প্রাধান্য পেয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে যেমন পুঁজিবাদের অসম বিকাশ ঘটে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটে না। স্বাভাবিকভাবে, পেট্রোলিয়াম সম্পদে সমৃদ্ধ রাশিয়া পেট্রোল ও প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনে গুরুত্ব আরোপ করেছে। রাশিয়ার ধনকুবের গোষ্ঠী এবং তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবসায় যুক্ত গাজপ্রম, রোসনেফট ইত্যাদি একচেটিয়া পুঁজি গোষ্ঠী দেশীয় অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয় এবং রাষ্ট্রও স্বাভাবিকভাবে এদের প্রতি আনুকূল্য দেখায়। ফলশ্রুতিতে ভোগ্যপণ্য, ইঞ্জিনিয়ারিং, রাসায়নিক, এমনকী পারিকাঠামো শিল্পের বিকাশ গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। এই সময়টাতে দেশে অসংখ্য ছোট-বড়-কলকারখানা লকআউট, শ্রমিক ছাঁটাই, লে-অফ ইত্যাদির কবলে পড়ে।

সাধারণ মানুষের আর্থিক দুর্গতি বাড়তেই থাকে। উপরন্তু শিল্পপতিরা তাদের উপার্জিত মুনাফার অর্থ দেশে লগ্নির পরিবর্তে বিদেশের ব্যাঙ্ক ও শেয়ার বাজারের ফাটকায় পুঁজি লগ্নি করতে বিদেশে চালান দেয়। সরকারের জ্ঞাতসারেই এসব ঘটছে।

রাশিয়ার সরকার বিশ্বের তেল শিল্পে দেশীয় পুঁজিপতিদের ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে এশিয়া, আফ্রিকা, তুর্কমেনিস্তান, কাজাকাস্তান, লিবিয়া, আলজেরিয়া, ভেনেজুয়েলা প্রভৃতি তেল সমৃদ্ধ দেশে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন শিল্পে বিনিয়োগ বাড়াতে উৎসাহ দিয়েছে। রাশিয়া নিজেকে গ্যাস ও তেলশক্তিতে বিশ্বে 'সুপার পাওয়ার' হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এজন্য গাজপ্রম, রোসনেফট ইত্যাদি তেল শিল্পের 'জায়ান্ট'দের সরকার সর্বাধিক সাহায্য-সহযোগিতা দেয়। অর্থনীতির উপর একচেটিয়া পুঁজির নিরঙ্কুশ প্রাধান্যের ফলে ছোট ও মাঝারি শিল্প নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। উপরন্তু পুতিন সরকার ছোট ও মাঝারি শিল্পের উপর ৪০ শতাংশ ট্যাক্সও আরোপ করে।

এর দ্বারা ছোট ও মাঝারি শিল্পগুলোকে উঠে যেতে, সংকুচিত হতেই সাহায্য করা হয়। দেশের অভ্যন্তরে পুঁজি বিনিয়োগের পরিসর সংকুচিত হওয়ায় অলস পুঁজি দুর্নীতির আধিক্য সৃষ্টিতে সহায়তা করে। বিশ্বের ১৮০টি অত্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় রাশিয়ার স্থান ১৪৬তম। ২০০৮ সালে দুর্নীতির মধ্য দিয়ে ৩০ হাজার কোটি রুবল অর্থাৎ জি ডি পি-র এক পঞ্চমাংশ অর্থ পুঁজিপতিদের লাভ হয়েছে।

এ থেকে সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে যে রাশিয়ায় শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থা কোন শোচনীয় স্তরে পৌঁছেছে। ধাতুশিল্প, রাসায়নিক, নির্মাণ, খুচরো ব্যবসা, ব্যাঙ্কিং সহ নানাবিধ শিল্পের এখন ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। বহু কারখানা উঠে গেছে। যেগুলো এখনো টিকে আছে সেখানে চলছে বেপরোয়া ছাঁটাই, লে-অফ, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ছে। রাশিয়া সরকারের অর্থনৈতিক বিকাশ দপ্তরের হিসাব মত ২০০৯ এর এপ্রিল নাগাদ রাশিয়ার বেকার শ্রমিক সংখ্যা ছিল ৭৫ লক্ষ। বাজার সংকটের ধাক্কায় কারখানাগুলো শ্রমিকদের মজুরি দিতে পারছে না। এমনকী ধনকুবের গোষ্ঠী চালিত কারখানাগুলোরও একই হাল। রাশিয়ার এক বৃহৎ ধনকুবের গোষ্ঠী 'ওলেগ-ডেরিপাসকা' তার শ্রমিকদের মজুরি দিতে না পারায় শেষ পর্যন্ত পুটিনের হস্তক্ষেপে মজুরি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। ২০০৯-এর জুন মাসে রাশিয়ার ১০ লক্ষাধিক শ্রমিকের প্রাপ্য মজুরি ২৬ কোটি ২০ লক্ষ ডলার অনাদায়ী হয়ে পড়ে থাকে। রাশিয়ার শিল্পাঞ্চলগুলোতে এখন আর কর্মচাঞ্চল্য নেই। রেল দপ্তর ৫৪ হাজার শ্রমিকের মজুরি ছাঁটাই করেছে। প্রতিরক্ষা শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থা একইরূপ। কিরভে অটোমেটিক রাইফেল কালাস্নিকভ্ তৈরির কারখানা মোলোট-এর শ্রমিকদের মজুরি দিতে না পারায় কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত আটা, মাংস-চিনি ইত্যাদি সরবরাহ করতে বাধ্য হয়। মুদ্রাস্ফীতি এখন ১২-১৫ শতাংশ। এর ফলে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ৪০ শতাংশেরও বেশি কমে গিয়েছে। সোভিয়েত শাসনকালে দেশে একটি ফ্যাক্টরিকে কেন্দ্র করে যে ছোট ছোট ফ্যাক্টরি টাউন বা 'মনো সিটি'গড়ে উঠেছিল, তাতে মোট জনসংখ্যার ১২ শতাংশ এখন বাস করে। এখানকার শ্রমিকদের আপৎকালীন সাহায্যটুকুও আর নেই। বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রতিবেদনে জানা যাচ্ছে যে, রাশিয়ায় এখন ১৭.৪ শতাংশ নাগরিক বা ২ কোটি ৪৬ লক্ষ মানুষ ন্যূনতম জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় মাসিক ১৮৫ ডলার আয়ের নিচে বসবাস করছেন। ২০১০ সালে তাদের সংখ্যা আরও ৫ শতাংশ বেড়ে যাবে বলে আশঙ্কা করা হয়েছে।

১৯১৭ সালে নভেম্বর মাসে রাশিয়ায় সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হয়। কিন্তু সোভিয়েত প্রতিষ্ঠার পরে দীর্ঘ ৭ বছর গৃহযুদ্ধ ও বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে শিশু রাষ্ট্রকে চলতে হয়েছে। এই সময়ে দেশের বহু কারখানা, পরিবহণ ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও খাদ্যশস্য ধ্বংস হয়ে যায়। আবার আধুনিক কলকারখানা গড়ে তুলতে দক্ষ শ্রমিক, কারিগর, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী ও দক্ষ পরিচালকেরও ছিল অভাব। তেমন পরিস্থিতিতে মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে বহু পরিকল্পনা ও কর্মপ্রয়াসের মধ্য দিয়ে ১৯২৯ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ সোভিয়েতের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত করেছিল। বিস্ময়কর ঘটনা হল, ১৯৩১ সালে ১ অক্টোবরের মধ্যে সমস্ত কর্মক্ষম ব্যক্তির কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করতে পেরেছিল সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া।

বছর (১লা এপ্রিল)	সোভিয়েট ইউনিয়নে বেকার সংখ্যা (হাজারে)
১৯২৯	১,৪৭২
১৯৩০	১,০৪০.৫
১৯৩১ (১লা অক্টোবর)	২০৫.৭

এবার মহামন্দার সময়ে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর সাথে সোভিয়েতের শিল্প ও শিল্পোৎপাদনের তুলনামূলক বিচার করা যাক। ১৯২৯ সালকে ভিত্তি বছর ধরে ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর শিল্প ও শিল্পোৎপাদনের তুলনামূলক বিচার করলে বোঝা যাবে যে, সেই কঠিন দিনগুলোতে যখন পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো সংকট কাঁপছে তখন কী দ্রুতগতিতে সোভিয়েত শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। নিচের সারণি থেকে তা বুঝতে সুবিধা হবে।

রাশিয়ার জনগণ একদিন শোষণ-নৈরাজ্যমুক্ত এই সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অভ্যন্তরেই ছিলেন। অথচ আজ তাদের জীবনে কী দুঃখময় পরিস্থিতি। মহান স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর ক্রুশ্চেভ সংশোধনবাদী চক্র পার্টি ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করে সংশোধনবাদের চর্চা ও প্রয়োগের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রতিবিপ্লব ঘটাতে সমর্থ হয়। মানবসভ্যতার ক্ষেত্রে এ এক অপূরণীয় ক্ষতি। কিন্তু মানুষ আবার নতুন করে ভাবছে। রাশিয়ার মানুষও সংগ্রামের পথে ক্রমশ এগিয়ে আসছে। ফেলে আশা দিনগুলোর পর্যালোচনা হচ্ছে। অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে শ্রমিকশ্রেণী চলার পথকে সুগম করবে— এটা নিশ্চিত।

ইউ এস এস আর সহ প্রধান প্রধান পুঁজিবাদী দেশগুলোর শিল্পের বিকাশ
১৯১৩-১৯৩৮ সাল পর্যন্ত (১৯১৩ কে ভিত্তি বছর ধরে)

	১৯১৩	১৯৩৩	১৯৩৪	১৯৩৫	১৯৩৬	১৯৩৭	১৯৩৮
সেভিয়েট ইউনিয়ন	১০০.০০	৩৮০.৫	৪৫৭.০	৫৬২.৫	৭৩২.৭	৮১৬.৪	৯০৮.৮
ইউএসএ	১০০.০০	১০৮.৭	১১২.৯	১২৮.৬	১৪৯.৮	১৫৬.৯	১২০.০
বৃটেন	১০০.০০	৮৭.৭	৯৭.১	১০৪.০	১১৪.২	১২১.৯	১১৩.৬
জার্মানি	১০০.০০	৭৫.৪	৯০.৪	১০৫.৯	১১৮.১	১২৯.৩	১৩১.৬
ফ্রান্স	১০০.০০	১০৭.০	৯৯.০	৯৪.০	৯৮.০	১০১.০	৯৩.২

শিল্পোৎপাদনের বিকাশ প্রসঙ্গে (১৯২৯ কে ভিত্তি বছর : ১০০ ধরে)

	১৯৩৪	১৯৩৫	১৯৩৬	১৯৩৭	১৯৩৮
ইউ এস এ	৬৬.৪	৭৫.৬	৮৮.১	৯২.২	৭২.০
বৃটেন	৯৮.৮	১০৫.৮	১১৫.৯	১২৩.৭	১১২.০
ফ্রান্স	৭১.০	৬৭.৪	৭৯.৩	৮২.৮	৭০.০
ইটালি	৮০.০	৯৩.৮	৮৭.৫	৯৯.৬	৯৬.০
জার্মানি	৭৯.৮	৯৪.০	১০৬.৩	১১৭.২	১২৫.০
জাপান	১২৮.৭	১৪১.৮	১৫১.১	১৭০.৮	১৬৫.০
ইউএসএসআর	২৩৮.৭	২৯৩.৪	৩৮২.৩	৪২৪.০	৪৭৭.০

ক্যানিং স্টেশনে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের দাবি জানালেন সাংসদ তরুণ মণ্ডল

ক্যানিং স্টেশনে নতুন প্ল্যাটফর্ম নির্মাণ ও সম্প্রসারণকে কেন্দ্র করে সংলগ্ন গ্যাব্রিয়েল গেট কলোনির বাসিন্দারা বর্ষার প্রাকমুহূর্তে উচ্ছেদের সম্মুখীন। এই কলোনির অসহায় হতদরিদ্র বাসিন্দারা ১ জুন এলাকার সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডলের কাছে তাদের পুনর্বাসনের আর্জি নিয়ে দেখা করেন। ডাঃ মণ্ডল ঐ দিনই এলাকাটি পরিদর্শন করেন। বস্তিবাসীরা জানান, রেলের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ তাঁরাও চান। দীর্ঘ ৪০-৫০ বছর ধরে তাঁরা এই কলোনিতে বসবাস করছেন। তাঁদের প্রত্যেকটি পরিবারের রেশনকার্ড, ভোটার আইডেনটিটি কার্ড এবং পঞ্চায়েতকে দেওয়া ট্যাক্সের রসিদও আছে। মাননীয়া রেলমন্ত্রীও ঘোষণা করেছিলেন যে, দীর্ঘদিন ধরে

উদ্বিগ্ন বাসিন্দাদের কথা শুনছেন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল

যাঁরা হকার বা বসবাস করছেন তাঁদের উচ্ছেদ করতে হলে পুনর্বাসন দিয়েই তা করা হবে। অথচ মন্ত্রীর এই ঘোষণা এখানে অনুসরণ করা হচ্ছে না। সাংসদ ডাঃ মণ্ডল রেলের উচ্চপদস্থ কর্তাদের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

৩ জুন ক্যানিং রেলওয়ে হকার্স-ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও বসতি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি এবং রেলসাইড স্মল ট্রেডার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটির প্রতিনিধিদের নিয়ে ডাঃ তরুণ মণ্ডল শিয়ালদহ ডি আর এম-এর সাথে দেখা করেন এবং তাঁদের দাবিগুলি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ক্যানিং-ভাঙনখালি রেললাইন সম্প্রসারণের যে কাজ শুরু হয়েছে তার সামগ্রিক পরিকল্পনা কী এবং তার জন্য কত বস্তিবাসী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী উচ্ছেদ হবে, তাঁদের পুনর্বাসনের বিষয়ে রেলের পরিকল্পনা কী, তা জানা দরকার। এই মুহূর্তে গ্যাব্রিয়েল গেট কলোনিতে ৭২টি পরিবার, কুজি পাড়ায় ২৫০টি, মমতাপল্লীতে ২০০টি ও কার্গিল কলোনিতে প্রায় ২০০টি পরিবার বসবাস করেন এবং বেশ কয়েক শত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও হকার রেলবাজারে ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করেন। রেলের উন্নয়নের জন্য পুনর্বাসন দিয়েই যেন উচ্ছেদ করা হয়। ডাঃ মণ্ডল জানান, উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ স্টেশন চত্বরে উচ্ছদ হওয়া ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি করে দীর্ঘমেয়াদী লিজে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। ক্যানিংয়েও সেই মডেল অনুসরণ করে সমস্যার সমাধান করা যায়।

ডি আর এম জানান, তিনি এলাকাটি পরিদর্শন করবেন এবং সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হবেন।

এ ছাড়াও ডায়মন্ডহারবার লাইনে হোটর স্টেশনে ডবল লাইন পাতার ফলে একটি নতুন রাস্তা ও ফুট-ওভারব্রিজ তৈরি যে আবশ্যিক হয়ে পড়েছে, তাও ম্যাপ সহ ডি আর এমের কাছে তুলে ধরা হয়।

বাংলাদেশে কৃষি ও কৃষক-খেতমজুর বাঁচাতে জাতীয় বাজেটের ৪০ শতাংশ বরাদ্দের দাবি

সমাজতান্ত্রিক খেতমজুর ও কৃষকফ্রন্টের উদ্যোগে ৩ জুন ঢাকার মুক্তাঙ্গণে কৃষক ও খেতমজুর সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি, কৃষক ও খেতমজুরদের বাঁচাতে জাতীয় বাজেটের ৪০ শতাংশ কৃষিখাতে বরাদ্দের দাবিতে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্তী। বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ খেতমজুর সমিতির সভাপতি কমরেড সামসুজ্জামান সেলিম, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশনের সভাপতি কমরেড বদরুল আলম, সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশিদ ফিরোজ, সাংগঠনিক সম্পাদক কমরেড আহসানুল হাবিব সাঈদ ও দপ্তর সম্পাদক কমরেড নিখিল দাস।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, বাংলাদেশের কৃষক ও কৃষি চরম অবহেলার শিকার। জাতীয় আয়ের ৩০ শতাংশ কৃষিখাত থেকে এলেও স্বাধীনতার ৩৯ বছর ধরেই বাজেটে এ খাত উপেক্ষিত। কৃষক ন্যায্য মূল্যে কৃষি উপকরণ পায় না, ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় না, খেতমজুর-ভূমিহীন কৃষকদের সারা বছরের কাজ নেই, খাদ্য নেই। স্বাধীনতার পর থেকেই গ্রামীণ বেকারের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে, বাড়ছে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা। কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠা একদিকে কৃষির উন্নতি ঘটাতে, অন্যদিকে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান তথা বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারে, অথচ এ দাবির প্রতি শাসক সরকারের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। উপরন্তু পাটকল, চিনিকল সহ যেসকল কৃষিভিত্তিক শিল্প রয়েছে তা সাম্রাজ্যবাদীদের পরামর্শে এবং দেশি লুটেরাদের স্বার্থে একের পর এক বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। নেতৃবৃন্দ বলেন, গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সরকারের নেওয়া ভিজিডি, ভিজিএফ, কর্মসৃজন প্রকল্প, টেস্ট রিলিফ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য/টাকা, দুঃস্থ মাতা, বয়স্ক ভাতা প্রকল্পে ঘুষ, দুর্নীতি দলীয়করণ সীমা ছাড়িয়েছে। কোনও সরকারই এর প্রতিকারের ব্যবস্থা না করে দলীয় লোকদের জন্য লুঠপাটের ব্যবস্থা করে রেখেছে। কৃষি-ভর্তুকিতে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে হয়রানি ও দুর্নীতি চলছে অবাধে।

ধান, আলু, টমেটো সহ কৃষি ফসলের সরকার নির্ধারিত দাম কৃষক পায় না। মাঝখান থেকে লাভবান হয় মধ্যসত্ত্বভোগী ফড়িয়া, টাউটসিন্ডিকেট, ব্যবসায়ী ও অসৎ সরকারি কর্মকর্তারা। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সারা বছরের খাদ্যের নিরাপত্তার জন্য সামরিক বাহিনীর রেটে গ্রামীণ রেশনিং-এর দীর্ঘদিনের দাবিও মানা হচ্ছে না। এই অবস্থায় কৃষক-খেতমজুর তথা গ্রামীণ শ্রমজীবীদের বাঁচাতে এবং দেশ বাঁচাতে, কৃষি বাঁচাতে জাতীয় বাজেটে উন্নয়ন বরাদ্দের ৪০ শতাংশ কৃষিখাতে বরাদ্দ করার দাবি জানান।

নেতৃবৃন্দ উৎপাদন মূল্যের উপর ৪০ শতাংশ যোগ করে সমস্ত কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণের দাবি জানান। একই সাথে সামরিকবাহিনীর রেটে গ্রামীণ রেশনিং চালু করে কৃষক খেতমজুর সহ গ্রামীণ শ্রমজীবীদের খাদ্য-নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং গ্রামীণ সকল প্রকল্পে দুর্নীতি অনিয়ম বন্ধ, খাস জমি প্রকৃত ভূমিহীনদের মাঝে বণ্টন, ভূমিহীনদের রেজিস্ট্রেশন কার্ড প্রদানের দাবি জানান।

হরিহরপাড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডেপুটেশন

৩১ মে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিক্ষোভ দেখায় হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি। আউটডোরে নির্দিষ্ট সময়ে ডাক্তারের উপস্থিতি, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাই নিয়োগ, হাসপাতালে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ প্রভৃতি দাবিতে এবং ন্যাশনাল রুরাল হেলথ প্র্যাকটিশনার্স বিল ২০১০ প্রত্যাহারের দাবিতেই ছিল এই বিক্ষোভ। রোগীদের আত্মীয়-স্বজনও বিক্ষোভে সামিল হন। স্মারকলিপি গ্রহণ করে হাসপাতাল আধিকারিক ডাঃ শুভময় দাস দাবিগুলি পূরণের আশ্বাস দেন। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা কমরেড পূর্ণিমা কর্মকার ও অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক ইউথ অর্গানাইজেশনের জেলা সভাপতি কমরেড গোলাম আম্বিয়া। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন ডি ওয়াই ও-র জেলা সম্পাদক কমরেড অনুপ সিনহা সহ জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির নেতৃবৃন্দ।

অখাদ্য খেতে বাধ্য হয়ে গরিব মারা যাচ্ছে পুঁজিপতিরা বলছে রেশন তুলে দাও

২৪ মে ইংরেজি দৈনিক 'দি হিন্দু' পত্রিকায় দু'টি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম সংবাদটি হল, বছর তিনেক আগে বিহারের গয়া জেলার মোহনপুর ব্লকের একটি গ্রামে একটি মৃত ছাগলের মাংস খেয়ে ১৪ জন অতি দরিদ্র মানুষ মারা যান। পচা মাংস খাওয়ার মতো অস্বাভাবিক এবং মর্মান্তিক এই ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা যায় যে, তাঁরা দীর্ঘদিন অভুক্ত-অর্ধভুক্ত ছিলেন। খিদে মেটানোর জন্য দু'মুঠো অন্ন সংগ্রহ করতে পারেননি। সরকারি হিসাব মতো এঁরা হলেন 'অন্ত্যোদয়' তালিকাভুক্ত, অর্থাৎ দারিদ্রসীমার (বিপিএল) একেবারে নিচের অংশের মানুষ। এঁদের খাদ্য নেই, বাসযোগ্য ঘর নেই, কাজ নেই, দীর্ঘদিন দুঃস্থ জীবন যাপনের ফলে অনেকেরই কর্মক্ষমতাও নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আর্থিক দিক থেকে এঁরা হলেন সমাজের বিপন্ন মানুষ। কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাবে ভারতবর্ষে এদের সংখ্যা ২ কোটি ৪৩ লক্ষ।

দ্বিতীয় সংবাদটি হল, ভারতবর্ষের পুঁজিপতিদের সংগঠন ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান চেম্বারস অফ কমার্স অ্যান্ড ইনডাস্ট্রিজ (ফিকি) দাবি করছে, গণবণ্টন ব্যবস্থার (রেশন) মাধ্যমে খাদ্যশস্য সংগ্রহ, গুদামজাত করা ও বণ্টনের যে দায়ভার এতদিন কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ছিল, তা সরকারকে ছেড়ে দিতে হবে। ফিকি-র বক্তব্য হল, ব্যবসায়ীদের হাতে এর দায়ভার তুলে দিতে হবে এবং বিপিএলভুক্ত বা দারিদ্রসীমার নিচের জনগণের জন্য খাদ্যদ্রব্যে এত দিন ধরে যে ভর্তুকি দিয়ে আসা হচ্ছে তা বাতিল করে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার কুপন তাদের দেওয়ার ব্যবস্থা হোক যাতে করে ঐ কুপন দিয়ে তারা সরকার নির্দিষ্ট দোকান থেকে নির্দিষ্ট প্রকারের বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য তাদের প্রয়োজনমতো কিনে নিতে পারে। টয়লেট দ্রব্য, গৃহে ব্যবহৃত কাগজে তৈরি দ্রব্যাদি, ওষুধপত্র ও তৈরি করা খাদ্যদ্রব্য বাদে খাদ্যশস্য ডাল, তৈলবীজ, চিনি ইত্যাদি তারা ঐ কুপন দিয়ে কিনতে পারবে। ফিকির সুপারিশ হল, বিপিএলভুক্তদের মধ্যে ২ কোটি ৪৩ লক্ষ অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনাভুক্ত মানুষদের দিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে একাজ শুরু করা হোক। তাদের আরও দাবি, রাজ্য সরকারগুলি নিজ নিজ ক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে খতিয়ে দেখবে কারা অর্থনৈতিকভাবে বিপিএল মানের উর্ধ্বে উঠেছে; যারা উঠল তাদেরকে নিয়মিতভাবে বিপিএল তালিকা থেকে বাদ দিয়ে যেতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত বিপিএল তালিকা নিঃশেষ না হচ্ছে। পুঁজিবাদী শোষণে এই মানুষগুলি রিক্ত নিঃস্ব। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির প্রভাবে যে রেশন ব্যবস্থা এদেশে গড়ে উঠেছিল এখন বুর্জোয়ারা তা তুলে দেওয়ার মতলব করছে।

বিশ্বব্যাপী গভীর বাজার সংকটের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য বিশ্বায়নের যে পরিকল্পনা পুঁজিপতিরা নিয়েছিল, সেটা যে ব্যর্থ তা এই স্বল্পকালীন সময়েই প্রমাণিত হয়েছে। জনগণের ট্যাক্সের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ডলার পুঁজিপতিদের ভর্তুকি দিয়েও তারা বাজারকে চাঙ্গা করতে পারছে না। সংকট সমাধানের রাস্তাও খুঁজে পাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে, সমস্যা সমাধানে যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তার মধ্যেই আরও বড় সমস্যার কারণ নিহিত রয়েছে এবং সময়মতো তা ফেটেও পড়ছে। অবস্থা এমন যে তাদের পরিচালিত অর্থনীতির গতিবিধি তারাই ধরতে পারছে না। সংকটের আবর্তে তারা আজ হাবুডুবু খাচ্ছে।

এদেরই অংশীদার ভারতীয় পুঁজিপতিদের উপরোক্ত আচরণের মধ্যে তার ছাপ পরিষ্কার। অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে এরা এখন বেপরোয়া, কোনও ন্যায়নীতির ধার ধারে না। গণতন্ত্রের ন্যূনতম রীতিনীতি পর্যন্ত রক্ষা না করে পুঁজিপতিরা সমাজের দরিদ্রতম অংশের মানুষের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে মুনাফার নাগপাশে তাদের শৃঙ্খলিত করতে রাষ্ট্রকে নির্দেশ দিচ্ছে।

যে পুঁজিবাদ তার জন্মলগ্নে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, বিজ্ঞান ও মানবতার ঝাণ্ডা তুলেছিল, আজ তার কী করুণ পরিণতি! আজ তাদের সমাজকে দেওয়ার আর কিছুই নেই — তারা পরগাছা, সভ্যতার অগ্রগতির প্রতিবন্ধক, মনুষ্যত্বের বিকাশে অন্তরায়। স্বাভাবিকভাবেই ন্যূনতম দেশপ্রেম তাদের কাছে, তাদের ভাড়াটে বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতাদের কাছে খুঁজে পাওয়া ভার। নয়ত তারা বুঝতে পারত, কী অসহায় দারিদ্রের মধ্যে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ক্ষুধা নিবারণের জন্য মাটি খায় — সাময়িকভাবে ক্ষুধার যন্ত্রণার উপশমের আশায়। এ সভ্যতার লজ্জা! গ্রামের দরিদ্র পল্লিতে, শহরের বস্তিতে গেলে দেখা যাবে খিদে চেপে রাখার পরিণামে জটিল রোগ-ব্যাধিতে কত প্রাণ অকালে ঝরে পড়ছে। সুউচ্চ নয়নাভিরাম অট্টালিকা, আধুনিক নগর-বন্দর, প্রশস্ত ঝকঝকে হাইওয়ে, পাঁচতারা হোটেলের আরাম-আয়েশ, সামরিক সম্ভার ও তার ঔদ্ধত্য ইত্যাদির আড়ালে এই হল আসল ভারতবর্ষ, যেখানে সরকারি কমিশনের হিসাব মতো ৭৭ শতাংশ মানুষ দৈনিক মাত্র ২০ টাকায় দিন কাটায়। কোটি কোটি মানুষ বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে শাক, পাতা ফলমূল আহরণ করে দিন গুজরান করে। উন্নয়নের ফাঁকা বুলি নিমেষে উবে যায় যখন পরিসংখ্যান বলে, ভারতবর্ষে ৫০ শতাংশ শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে — আফ্রিকার সাহারা মরু এলাকার দেশগুলোর অবস্থাও এর চেয়ে ভাল। বিশ্বের ক্ষুধার্ত মানুষের তালিকায় ভারতবর্ষ ৮৮ টি দেশের মধ্যে এখন ৬৬তম স্থানে, আর বিশ্বের মোট ক্ষুধার্তদের এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ ২৩ কোটি মানুষের বাস এই ভারতবর্ষে। এর নাম উন্নয়ন? মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষের কাছে তা যতই বেদনার হোক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এর চেয়ে বেশি কিছু দিতে পারবে না।

শ্রমিকদের স্থায়ীকরণ না করা মুনাফাবৃদ্ধিরই কৌশল

আমাদের দেশের কিছু মানুষ মনে করেন, যদি স্থায়ী চাকরির ব্যবস্থা না থাকে, যদি শ্রমিকদের মধ্যে কাজ হারানোর বা ছাঁটাইয়ের আশঙ্কা থাকে, যদি ট্রেড ইউনিয়ন না থাকে তাহলে শ্রমিকরা কাজে ফাঁকি দেবে না, ভাল কাজ হবে, উৎপাদন বাড়বে এবং এটা শিল্পের পক্ষে মঙ্গলজনক। তাঁরা বেসরকারিকরণ-উদারিকরণকে সমর্থন করেন, ঠিকাপ্রথা-চুক্তিপ্রথায় কাজকেই ন্যায্য মনে করেন। অপরদিকে আর একদল মানুষ আছেন, যাঁরা মনে করেন ইউনিয়ন না থাকলে, চাকরি পাকা না হলে মালিক ও কর্তৃপক্ষের স্বৈরাচারের ওপর লাগাম থাকবে না। ফলে কাজের পরিবেশ নষ্ট হবে, শিল্পের ক্ষতি হবে। এঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, এঁরা বেসরকারিকরণ-উদারিকরণ-ঠিকাপ্রথা ইত্যাদির বিরুদ্ধে এবং কাজের স্থায়ীকরণের দাবিতে সোচ্চার।

যাঁরা ঠিকা প্রথার সমর্থক, তাঁদের অভিমত — 'সব শ্রমিক কাজে ফাঁকি দেয়'। এ কথা কি সত্য? এ কথা সত্য হলে গোটা উৎপাদন ব্যবস্থাটাই তো ধসে পড়ত। সমাজের সব অংশের মানুষের মতো মুষ্টিমেয় কিছু শ্রমিকের মধ্যে ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা থাকতে পারে, কিন্তু তা ব্যতিক্রমই। তাছাড়া ব্যক্তিস্বার্থ ষোল আনা বোঝা, কর্তব্যকর্মে অবহেলা, কাজ না করে পারিশ্রমিক পাওয়ার মানসিকতা শ্রমিকসংস্কৃতি নয়। এটা পুঁজিবাদী সমাজেরই একটা ব্যাধি, যা শ্রমিকদের মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের হলেও সত্য, শাসক দলগুলির ট্রেড ইউনিয়নগুলি তাদের সংগঠনের সদস্য হতে উৎসাহিত করতে, শ্রমিকদের কাছে সহজে প্রিয় হওয়ার জন্য কর্তব্যকর্মে ফাঁকি দেওয়া, কর্মক্ষেত্রে দেরিতে এসে আগে যাওয়া, ঘুষ-দুর্নীতি ইত্যাদিকে প্রশ্রয় দেয় যা অবশ্যই নিন্দনীয়।

যাঁরা বলছেন, ছাঁটাইয়ের ভয় থাকলে ভাল কাজ হবে, তাঁদের যুক্তি মেনে নিলে ক্রীতদাস প্রথা মানতে হয়, কারণ সেখানে চাবুকের মার ছিল কাজের টনিক। কিন্তু দাসপ্রভুদের চাবুক, উৎপাদনের মুখ থুবড়ে পড়াকে আটকাতে পারেনি। তাছাড়া কাজের স্থায়িত্ব থাকবে না, শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি থাকবে না, বৃদ্ধ বয়সে চলার মতো আর্থিক সংস্থান দেওয়া হবে না এটা কি কোনও সভ্য সমাজের রীতি? তাহলে মানুষ আদিম অবস্থা থেকে জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে যুগ যুগ ধরে লড়াই করে এই মানবসভ্যতা, সংস্কৃতি, মনুষ্যত্ব, বিবেক গড়ে তুলেছে কেন?

'উৎপাদন ভাল হবে' এই যুক্তি তুলে যাঁরা ঠিকাপ্রথা-চুক্তিপ্রথাকে এবং ক্যাজুয়ালাইজেশনকে সমর্থন করেন, তাঁরা কি জানেন, অতি-উৎপাদনই বুর্জোয়া সমাজে আজ মারাত্মক সংকট হিসাবে দেখা দিয়েছে? গুদামে মাল উদ্বৃত্ত হয়ে পড়ে থাকে, বিক্রি হয় না। কারণ, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী কেনার ক্ষমতা নেই। বুর্জোয়া শোষণব্যবস্থা মানুষকে রিক্ত নিঃস্ব করে তার ক্রয়ক্ষমতা নিঃশেষ করে দিয়ে তাকে বাজার থেকে হঠিয়ে দিয়েছে। বাজারে পণ্যের চাহিদা যদি প্রবল মাত্রায় থাকত তাহলে মালিকরা কি নিজেরাই কারখানা লকআউট করে দিত? ২০০১ সালে পশ্চিমবঙ্গে ৩০৫টি কারখানায় মালিকরা লকআউট করেছে, অপরপক্ষে কারখানায় শ্রমিক ধর্মঘট হয়েছে মাত্র ২০টি (সূত্রঃ লেবার ইন ওয়েস্টবেঙ্গল ২০০১)।

ফলে মালিকরা প্রচুর উৎপাদন চায়, এ কথা সত্য নয়। তাহলে কাজের স্থায়িত্ব না থাকলে, ছাঁটাইয়ের আশঙ্কা থাকলে উৎপাদন ভাল হবে, এ কথা বলা হচ্ছে কেন? এর পিছনে রয়েছে মালিকদের এক শয়তানি, তা হল তীব্র বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে অস্থায়ী শ্রমিকদের দিয়ে কম বেতনে কাজ করিয়ে, ইএসআই-গ্র্যাচুইটি-বোনাস-মেডিকেল বেনিফিট-পেনশন ইত্যাদির কোনও দায় না নিয়ে, কাজের ঘন্টা বাড়িয়ে শ্রমিকদের নির্মম শোষণ করে মুনাফার হার বাড়িয়ে যাওয়া। মালিকদের এই শয়তানি ধরতে না পেরে অথবা জেনেও কিছু মানুষ মালিকদের স্বার্থে স্থায়ী চাকরির পরিবর্তে ঠিকাপ্রথা-চুক্তিপ্রথাকে সমর্থন করছেন।

যাঁরা স্থায়ী চাকরির পরিবর্তে অস্থায়ী প্রথা সমর্থন করছেন, তাঁরা কি জানেন শ্রমিকদের জীবন কত দুঃখের? সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক-কর্মচারীদের কাজের স্থায়িত্ব, মোটামুটিভাবে বাঁচার মতো মজুরি থাকলেও অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের অবস্থা দুর্বিষহ। দেশের মোট শ্রমিক সংখ্যার ৯৩ শতাংশই অসংগঠিত শ্রমিক। এর বাইরে আছে এক বিরাট সংখ্যক কর্মহীন মানুষ।

কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম দপ্তরের শিল্প সার্ভে রিপোর্ট অনুযায়ী, পেট্রোলিয়াম শিল্পে ঠিকা শ্রমিক, মোট শ্রমশক্তির ৭০ শতাংশ; নির্মাণ শিল্পে ৯০ শতাংশ; ইস্পাত শিল্পে ৫০ শতাংশ; তথ্য প্রযুক্তি ও পরিষেবায় ৭০ শতাংশ; বিদ্যুৎ শিল্পে ৪০ শতাংশ; অটোমোবাইল শিল্পে ৬০ শতাংশ; চর্ম শিল্পে ৭০ শতাংশ; চট শিল্পে ৩০ শতাংশ; পোশাক শিল্পে ১০০ শতাংশ। বর্তমানে বেসরকারি শিল্প সংস্থায় কর্মরত স্থায়ী শ্রমিকের তুলনায় অস্থায়ী শ্রমিকের আনুপাতিক হার ৯০ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। দেশের উৎপাদনের ক্ষেত্রে ৪ কোটি ৮০ লক্ষ শ্রমিকের মধ্যে — ৪ কোটি ১৪ লক্ষ শ্রমিকই ঠিকা বা অসংগঠিত শ্রমিক।

শ্রমিক বললে আজ জনসংখ্যার এমন একটা অংশকে বোঝায় যারা শ্রম দিয়েও বেঁচে থাকার রসদ জোগাড় করতে পারছে না। এই অসংগঠিত শ্রমিকদের মধ্যে ঠিকা শ্রমিকরা আবার সবচেয়ে বেশি শোষিত। এরা দ্বৈত শোষণের শিকার। একদিকে সংস্থার মালিকের দ্বারা শোষিত, অন্যদিকে কন্ট্রাক্টর বা ঠিকাদারের দ্বারা শোষিত। ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলন দীর্ঘকাল ধরে এই অন্যায় প্রথা বাতিলের দাবি জানিয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এটিকে বাতিলের পরিবর্তে 'কন্ট্রাক্ট লেবার (অ্যাবলিশান অ্যান্ড রেগুলেশন) অ্যাক্ট ১৯৭০' দ্বারা আইনসিদ্ধ করেছে। যদিও এই আইনে বলা হয় স্থায়ী ধরনের কাজে ঠিকা শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ, ঠিকা শ্রমিকরা সমস্ত শ্রম আইনের আওতায় থাকবেন। ঠিকাদারকে ঠিকা শ্রমিকদের জন্য নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র, বেতনের স্লিপ, রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে বেতন প্রদান ইত্যাদি ব্যবস্থা চালু করতে হবে। কিন্তু বাস্তবে এগুলি করা হয় না।

ন্যূনতম বেতন আইনে বলা হয়েছে, রাজ্য সরকার ঘোষিত ন্যূনতম বেতন ঠিকা ও অস্থায়ী শ্রমিকদের দিতে হবে। ১৯৫২ সালের প্রভিডেন্ট ফান্ড আইনে বলা হয়েছে, ঠিকা ও অস্থায়ী শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের সদস্য করতে হবে। ১৯৪৮ সালের ইএসআই আইনে বলা হয়েছে, ঠিকা শ্রমিকদের ইএসআই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ১৯৬১ সালের মাতৃত্বকালীন সুবিধা প্রদান আইনে বলা হয়েছে, মহিলা ঠিকা শ্রমিকরা এই সুযোগ পাবেন। ১৯৭২ সালের গ্র্যাচুইটি প্রদান আইনে বলা হয়েছে, ঠিকা ও অস্থায়ী শ্রমিকরা গ্র্যাচুইটি পাবেন। ১৯৭৬ সালের সমকাজে সমবেতন আইনে বলা হয়েছে সমকাজে পুরুষ, মহিলা উভয়েই সমান বেতন পাবেন। কিন্তু আইনে এসব বলা থাকলেও মালিকরা আইন মানে না। তারা সবকিছু থেকে শ্রমিকদের বঞ্চনা করে চলেছে। আরও লক্ষণীয় যে, মালিকদের এই আইন লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সরকার বা আইনের রক্ষক পুলিশও কোনও ব্যবস্থা নেয় না।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিক কী করে বাঁচবে? তাকে কি বাঁচার মতো মজুরি দেওয়া হয়? অসংগঠিত ক্ষেত্রে এদের বেতনের কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। যত কম মজুরি দেওয়া যায় মালিক সেই চেষ্টাই করে। এদের জন্য নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি মানে 'ন্যায্য মজুরি' ('ফেয়ার ওয়েজ') বা 'বাঁচার মতো মজুরি' (লিভিং ওয়েজ) নয়। কীভাবে নির্ধারিত হয় ন্যূনতম মজুরি? ন্যূনতম তিনজনের পরিবারে, প্রত্যেকের দৈনিক ২৭০০ ক্যালরিযুক্ত খাদ্য, পরিবারপিছু বার্ষিক ৭২ গজ কাপড়, ন্যূনতম আয়তনের ঘরের ভাড়া, জ্বালানি, আলো ও অন্যান্য বিষয়ের ব্যয়ের ২০ শতাংশ অর্থ ধরে এবং চিকিৎসা, বৃদ্ধ বয়সের খরচ ইত্যাদির আরও ২৫ শতাংশ অর্থ যুক্ত করে এই ন্যূনতম মজুরি নির্ধারিত হয় (সূত্র ঃ নাগরিক মঞ্চ)।

এবার দেখা যাক, যে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারিত হয়েছে তা আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির বাজারে ধুঁকে ধুঁকে বাঁচার মতোও কি না।

২০০১ সালের হিসাব

শিল্প	কলকাতায় মাসিক বেতন	দৈনিক বেতন (টাকা)
১। ছাপাখানা	১৩১৫.০০	৪৩.৮০
২। পাথর ভাঙা	১৯১৫.৪৪	৬৩.৮৪
৩। প্লাস্টিক	২০৮৬.০০	৬৯.৫০
৪। কৃষি		৫৫.২৫ (খাবার ছাড়া)
৫। চালকল	১১৮৫.৫৫	৩৯.৫১
৬। ডেকরেশন	১৫৫১.৫০	৫১.৭১
৭। জুতো তৈরি	২০৭৪.০০	৬৯.১০
৮। দোকান	২০৬৫.০০	৬৮.৮০
৯। নির্মাণ	১৮৫৯.৫৩	৬১.৯৮
১০। দ্বাররক্ষী	১৬৬৬.৭৫	৫৫.৫৫

(সূত্রঃ লেবার ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল-২০০১)

এই তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে, ২০০১ সালের হিসাবে ৪০ থেকে ৭০ টাকার মধ্যেই ন্যূনতম দৈনিক মজুরি ঘুরপাক খাচ্ছে। ২০০১ সালে ৪০ টাকা দিয়ে তিনজনের পরিবারে দু'বেলা মোটা ভাত জোগাড় করা কি আদৌ সম্ভব ছিল? আর এই টাকা খাদ্যে চলে গেলে পরার কাপড়, মাথা গোঁজার ঝুপড়ি, একটু আলো, গায়ে মাখার একটু সাবান — এগুলি জোগাড় করা কি আদৌ সম্ভব ছিল? ফলে যাঁরা বলেন, কম বেতন দিলে শ্রমিক বেশি কাজ করবে, উৎপাদন বাড়বে তাঁরা শ্রমিকদের এই দুঃসহ জীবনের কোনও খবরই রাখেন কি? অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের ইতিমধ্যেই ১২ ঘন্টা ১৪ ঘন্টা করে খাটতে হচ্ছে। কোথাও আরও বেশি। এরপর আরও খাটানোর কথা বলা মানে তো দাস যুগে ফিরে যাওয়া! আজ ভাবতে হবে পুঁজিবাদ দেশটাকে কোথায় নিয়ে চলেছে।

আমরা আগেই দেখিয়েছি, যে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারিত হয়েছে তা বাঁচার মতো নয়। আবার যতটুকু নির্ধারিত হয়েছে রাজ্যের বেশিরভাগ অসংগঠিত শ্রমিক সেটাও পান না। পশ্চিমবঙ্গে ন্যূনতম মজুরি অন্য রাজ্যগুলির তুলনায় কম, তার উপর ন্যূনতম মজুরি ফাঁকি দেওয়ার বিরুদ্ধে কোনও আইনগত ব্যবস্থাও নেওয়া হয় না। ফলে কারখানাগুলিতে চলছে বুর্জোয়াদের দ্বারাই আইনকে পদদলিত করার জংলি রাজত্ব। এর বিরুদ্ধে শ্রমিক তো ফুঁসে উঠবেই। আর উঠলেই সেটা হয়ে যাবে শিল্পে শান্তি ভঙ্গ করা?

শ্রমিকস্বার্থে যে আইনগুলি দীর্ঘ সংগ্রামের ফলে প্রণীত হয়েছে আজ সেই আইনগুলির চূড়ান্ত লঙ্ঘন চলছে। একথা আজ স্পষ্ট যে, তীব্র শ্রমিক আন্দোলনের চাপ না থাকলে মালিকরা আইন কখনই মানবে না। তাদের আইন মানতে বাধ্য করতে হবে। দ্বিতীয়ত, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিক-স্বার্থে আইন ছিটেফোঁটা কিছু থাকলেও যেহেতু সরকার ও মালিকপক্ষের যোগসাজসে আইনের লঙ্ঘন চলে, ফলে এই ব্যবস্থায় শ্রমিকদের কোনও নিরাপত্তাই নেই। আসলে, অতি মুনাফার লোভে পুঁজিপতিশ্রেণী আপনসৃষ্ট সংকটের বেড়াজালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে হাঁসফাঁস করছে। তা থেকে পরিত্রাণের ব্যর্থ চেষ্টায় সংকটের সমস্ত বোঝা শোষিত জনগণের ঘাড়ে চাপাচ্ছে। তার মুনাফার অঙ্ক ঠিক রাখতে উৎপাদন ব্যয় কমানোর জন্যই সে শ্রমিকদের সমস্ত ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করছে। উচ্চ ক্রয়ক্ষমতাসম্পন্ন অল্পসংখ্যক মানুষের প্রয়োজনে স্বল্প উৎপাদনের জন্যই সে স্থায়ী শ্রমিক চায় না, চায় নামমাত্র মজুরির ঠিকা শ্রমিক। এর সাথে মানুষের কল্যাণ, সমাজের কল্যাণ, শিল্পের কল্যাণের কোনও সম্পর্কই নেই। আর, এই বৃহৎ পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থই রক্ষা করে চলেছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের সরকারগুলি।

কেন্দ্রীয় সরকারের মতো রাজ্য সরকারের শ্রমদপ্তরও এক্ষেত্রে হাত গুটিয়ে বসে আছে। ফলে রাজ্যের সিপিএম সরকার মুখে অসংগঠিত শ্রমিকদের স্বার্থ নিয়ে যাই বলুক, বাস্তবে ক্ষমতায় থেকে এদের স্বার্থে কিছুই করেনি। অসংগঠিত শ্রমিকের সমস্যা নিয়ে আন্দোলন ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যেতেও তাদের আন্তরিকতার অভাব স্পষ্ট। এখানেই রয়েছে এই সমাজ ব্যবস্থা পাল্টানোর অনিবার্যতা। এটাই প্রমাণ করে, ঐতিহাসিকভাবেই পুঁজিবাদের মৃত্যুঘন্টা বেজে গিয়েছে। সমাজকে বস্তুগতভাবে বা ভাবগত অগ্রগতির পথ সে দেখাতে পারে না। কিন্তু নিজে সে নতুন সমাজকে পথ ছেড়ে দেবে না। দরকার তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বিদায় করা। আর তার জন্যই চাই সংগ্রামী বিপ্লবী সংগঠন ও সঠিক বিপ্লবী নেতৃত্ব।

শিলিগুড়িতে শিক্ষা কনভেনশন

দেশব্যাপী সরকারি এবং সরকার অনুমোদিত ও সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলিতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা বিলোপের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের আহ্বানে ২২ মে শিলিগুড়িতে এক শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যাপক অসিতবরণ মন্ডল কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন।

অতি সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক বিদ্যালয় শিক্ষায় 'যশপাল কমিটি'-র সুপারিশ অনুযায়ী দেশব্যাপী সরকারি এবং সরকার অনুমোদিত ও সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রচলিত পরীক্ষাপদ্ধতি তুলে দিয়ে যে 'নো ডিটেনশন' পদ্ধতি চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, কনভেনশনে বিভিন্ন বক্তা তার বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য তুলে ধরেন। কনভেনশনে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী সৌমিত্র ব্যানার্জী এবং শিক্ষক নেতা তপন সামন্ত ভবিষ্যৎ আন্দোলনের রূপরেখা তুলে ধরেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপিকা শুক্লা পাল, রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক পিনাকী ব্যানার্জী, বিশিষ্ট নাট্যকার পার্থ চৌধুরী, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের শিক্ষক ও বিশিষ্ট চিকিৎসক পার্থপ্রতিম পান এবং মনোরোগ বিশেষজ্ঞ শান্তনু দে, বিশিষ্ট হিন্দি সাহিত্যিক রাজেন্দ্রপ্রসাদ সিং, অধ্যাপক বিকাশ দেব ও শিক্ষক দেবলাল সিং। অধ্যাপক অসিতবরণ মন্ডলকে সভাপতি এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অজিত কুমার রায়কে সম্পাদক করে ৫১ জনের সেভ এডুকেশন জেলা কমিটি গঠন করা হয়।

R.N.I. No 5268 / 60
Postal Registration No. KOL / RMS / 138 / 2010-12

কংগ্রেসী গুণ্ডাদের আক্রমণে হরিহরপাড়ায় ৪০ জন এস ইউ সি আই(সি) কর্মী আহত

মুর্শিদাবাদ জেলার হরিহরপাড়া থানার স্বরূপপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ৩০ মে সিপিএম মদতপুষ্ট কংগ্রেসী গুণ্ডাদের আক্রমণে প্রায় ৪০ জন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) কর্মী-সমর্থক গুরুতর আহত হন। এই গ্রাম পঞ্চায়েতে রয়েছে কংগ্রেস এবং সিপিএমের যুগ্ম বোর্ড। কংগ্রেসের ৫টি ও সিপিএমের ২টি আসন রয়েছে। এস ইউ সি আই (সি)-র রয়েছে ৪টি আসন। এই পঞ্চায়েতে নানা দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবং ১০০ দিনের কাজ, সঠিক বিপিএল তালিকা প্রকাশ, বিধবাভাতা প্রদান ইত্যাদি দাবিতে এস ইউ সি আই (সি) দলের পক্ষ থেকে আন্দোলন চলছিল। বিডিও'র নিকট ডেপুটেশনের প্রস্তুতি হিসাবে ৩০ মে এক সভার আয়োজন করা হয়। হরিহরপাড়া লোকাল কমিটির সদস্য কমরেডস হাসিবুল ইসলাম, লালন মণ্ডল, সামিম হাসান (গাজু) সহ স্থানীয় পার্টি নেতা কমরেড গোলাম মোস্তফা ও কমরেড কালামের নেতৃত্বে শতাধিক কর্মী- সমর্থক জমায়েত হন। সভা চলাকালীন আচমকা স্থানীয় কংগ্রেসী নেতা হাসিবুল মণ্ডলের নেতৃত্বে রহমান সেখ, সামাউল মণ্ডল, আইনুল, আসাবুল সহ কুখ্যাত ডাকাত ইস্রাইল সেখের গুণ্ডাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে। মারধর, অশ্রাব্য গালিগালাজ করে সভা পণ্ড করে দেয়।

কংগ্রেস-সিপিএমের মিলিত ষড়যন্ত্র বারংবার পুলিশ প্রশাসনকে জানানো সত্ত্বেও তারা কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়নি। বরং ৩০ মে কংগ্রেসীদের বর্বর হামলা ও সভা বাতিলের পর পুলিশ দুষ্কৃতীদের ধরার পরিবর্তে গ্রামে ঢুকে এস ইউ সি আই (সি)-র জনসভা করা ঠিক হয়নি বলে উস্কানি দিতে থাকে। পুলিশের আসকারা পেয়ে গুণ্ডাবাহিনীর কার্যকলাপ বেড়ে যায়। ৩১ মে কংগ্রেসী নেতা হাসিবুল মণ্ডলের নেতৃত্বে পলাতক কুখ্যাত ডাকাত ইস্রাইল সেখ, রহমান সেখের বাহিনী বোমা-বন্দুক নিয়ে নতুন স্বরূপপুর গ্রামে ব্যাপক হামলা চালায়। লুঠপাট, ভাঙচুর করে সর্বস্বান্ত করে দিয়ে যায়। প্রায় ৩৫টি পরিবার বিপন্ন, এস ইউ সি আই (সি)-র কমরেড বাক্কার আনসারীর স্ত্রী আনোয়ারা বেওয়া, মাফুজা বিবিকে প্রায় বিবস্ত্র করে। বিধবা মেরিনা বেওয়ার বাক্স ভেঙে বহু কষ্টে জমানো ৫ হাজার টাকা ছিনতাই করে, মেয়ে রেলেখা বেগমের ২ হাজার টাকা লুঠ করে নেয়। হারমাদ সেখের টিউবওয়েল উপড়ে নিয়ে যায়। ১৩ বছরের ছাত্রী ফেরদৌসী খাতুনকে গলা টিপে ধরে মারধর করে। তার ভাই জাকির হোসেনকে হাঁসুয়ার কোপ মেরে রক্তাক্ত করে। কমরেড আনারুলের হাত টুকরো টুকরো করে ভেঙে দেয়, ভোজালির কোপ মারে। তাকে বহরমপুর নিউ জেনারেল হাসপাতাল থেকে শেষ পর্যন্ত কলকাতায় এন আর এস হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হয়। কংগ্রেসী হামলাবাহিনী কৃষকদের ধানের গোলা তছনছ করে, টাকা, সোনা-দানা, সেলাই মেশিন প্রভৃতি সবকিছু লুঠ করে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। প্রায় চল্লিশ জন এস ইউ সি আই(সি) কর্মী-সমর্থক আহত হয়। কংগ্রেসী গুণ্ডা বাবুল সেখ, দোয়াত আলি, মাইনুল, সহিদুলরা এ ধরনের দুষ্কর্ম চালায়। পুলিশ হামলাবাজদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা তো নেয়ইনি, উপরন্তু ৬২ জন এস ইউ সি আই(সি) কর্মীর বিরুদ্ধে মিথ্যা কেস চাপিয়েছে। গ্রামের প্রায় সকল পুরুষ এবং বেশকিছু পরিবার ঘরছাড়া। ভৈরবী নদীর পাড়ে কংগ্রেসী হার্মাদরা বোমা-বন্দুক নিয়ে প্রস্তুত। যেকোনও মুহূর্তে আবারও আক্রমণের হুমকি দিচ্ছে তারা।

কংগ্রেসী নেতা হাসিবুল মণ্ডল ও সিপিএমের দাউদ হোসেন দীর্ঘদিন ধরে বোমা-বন্দুক জড়ো করে এস ইউ সি আই (সি)-এর সংগঠন ভাঙার জন্য আক্রমণের প্রস্তুতি চালাচ্ছে। কারণ এই সংগঠন কায়েমি স্বার্থবাজদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ৭০ দশকে স্বরূপপুর, সাহাজাদপুর অঞ্চলে বেনাম জমি, খাস জমি উদ্ধার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গরিব ভূমিহীন খেতমজুরদের রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সংগঠন গড়ে ওঠে। তেত্রিশ বছর ধরে সিপিএমের চূড়ান্ত জনবিরোধী শাসনের পরিণামে এবং কংগ্রেসীদের ঘৃণ্য সিপিএম সখ্যতায় মানুষ বীতশ্রদ্ধ হয়ে সরে দাঁড়াচ্ছে। এস ইউ সি আই (সি)-র সংগঠন বৃদ্ধিকে প্রতিহিংসার নজরে দেখছে এই দুই শাসক দল। ফলে যৌথ বোঝাপড়ার ভিত্তিতে এস ইউ সি আই (সি)-র

উপর সন্ত্রাস ও আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে বলে জানান দলের জেলা সম্পাদক কমরেড সাধন রায়।

দলের পক্ষ থেকে নতুন স্বরূপপুর ও স্বরূপপুর গ্রামে পুলিশ ক্যাম্প বসানোর দাবি জানানো হয়েছে। দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার, ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি দাবিতে লাগাতার আন্দোলনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অপূর্ব ব্যানার্জী সহ নেতৃবৃন্দ নতুন স্বরূপপুর গ্রাম পরিদর্শনে যান, মা-বোনেদের আশ্বস্ত করেন।

ত্রাণবাহী জাহাজে ইজরায়েলি হামলার তীব্র নিন্দা করল কেন্দ্রীয় কমিটি

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৩ জুন এক বিবৃতিতে বলেন, প্যালেস্টাইনের গাজা ভূখণ্ডে ত্রাণবাহী কয়েকটি ছোট জাহাজের উপর সাম্রাজ্যবাদী মদতপুষ্ট উগ্র ইহুদিবাদী ইজরায়েলের শাসকগোষ্ঠী মারাত্মক আক্রমণ চালিয়েছে। জেরুজালেমকে রাজধানী করে সার্বভৌম প্যালেস্টিনিয় রাষ্ট্রগঠনের ন্যায়সঙ্গত দাবিতে সংগ্রামরত মুক্তিযোদ্ধাদের উপর ঠিক এক বছর আগে গাজা ভূখণ্ডে ইজরায়েলিরা পাশবিক বর্বরতায় নারকীয় হত্যালীলা চালিয়েছিল। ২০০৭ সাল থেকে গাজা ভূখণ্ডকে বেআইনিভাবে অবরোধ করে রেখে ইজরায়েলি শাসকরা সেখানে খাদ্য, পানীয় জল, জ্বালানি, ওষুধ এবং অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রীর এক চূড়ান্ত সংকট সৃষ্টি করেছে। এবারেও তারা সমস্ত আন্তর্জাতিক আইন-কানুনকে পদদলিত করে এই অপরাধমূলক আক্রমণ চালাল। এই ভয়ঙ্কর হামলায় কমপক্ষে নয়জন নিরস্ত্র শান্তি আন্দোলনের কর্মী এবং নির্দয় প্রহারে ও বিদ্যুৎ শক প্রয়োগে আরও বহু জনের মারাত্মকভাবে আহত হওয়ার ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ।

সমস্ত আন্তর্জাতিক রীতিনীতিকে বেপরোয়াভাবে ভঙ্গকারী এই বর্বরোচিত ঘটনা সম্পর্কে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যে রকম মৃদু প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে, তাতে দুনিয়ার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সমস্ত মানুষের কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, পেন্টাগনের সরাসরি সমর্থন ছাড়া উগ্র ইহুদিবাদী ইজরায়েলের পক্ষে একটার পর একটা এরকম নিষ্ঠুর হামলা চালানো সম্ভব নয়। ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্টও মৃদু প্রতিবাদের মাধ্যমেই তাঁর কর্তব্য শেষ করেছেন। এই ঘটনা আবারও প্রমাণ করল যে, ইজরায়েলি শাসকগোষ্ঠীর এই বর্বরোচিত ক্রিয়াকলাপের পিছনে সাম্রাজ্যবাদী সুপার পাওয়ারগুলির যোগসাজস ও প্রশ্রয় রয়েছে। এই ধরনের ঘৃণ্য অপরাধকারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া দূরে থাক, এমনকী কঠোর নিন্দা করার পরিবর্তে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ দায়সারা গোছের যে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে, তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। কমরেড ঘোষ বলেন, রাষ্ট্রসংঘ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী এবং তার সহযোগীদের রাবার স্ট্যাম্পে পরিণত হয়েছে — শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের এই আশঙ্কাকে এই ঘটনা আবারও সত্য বলে প্রমাণ করে দিল।

এই ঘটনার প্রতিবাদে রুখে দাঁড়ানো, সামরিক হুমকি দেখানো এই ধরনের দুরভিসন্ধিমূলক কূটনীতির বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলা এবং প্যালেস্টিনিয় জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামের পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য কমরেড প্রভাস ঘোষ জনগণের কাছে আবেদন জানান।

প্যালেস্টাইনের গাজা ভূখণ্ডে ত্রাণবাহী জাহাজের উপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী মদতপুষ্ট উগ্র ইহুদিবাদী ইজরায়েলী হানার প্রতিবাদে ২ জুন আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে বিক্ষোভ

পুরনির্বাচনে জনমতের রায়

চারের পাতার পর

রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতি ও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছে রাজ্যের মানুষকে।

কংগ্রেসের ভোট কমেছে

৮১টি পুরসভা নির্বাচনে যুগপৎ সিপিএম ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জনমত ব্যক্ত হয়েছে। ২০০৫ সালে কলকাতা কর্পোরেশনে কংগ্রেস জিতেছিল ২১টি আসনে। এবার তারা জয়ী হয়েছে ১০টি আসনে। ৫টি আসন তারা হারিয়েছে। কংগ্রেসের মতো একটি সর্বভারতীয় দলে কলকাতা পুরসভায় ৪৬টি আসনে জামানত জব্দ হয়েছে। ২০০৫ সালে কংগ্রেস একক শক্তিতে বোর্ড গঠন করেছিল ১১টি পুরসভায় (কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, শান্তিপুর, রানাঘাট, বীরনগর, জয়নগর-মজিলপুর, শ্রীরামপুর, খড়্গপুর, কাটোয়া, বিষ্ণুপুর, বোলপুর)। এবার তারা একক শক্তিতে বোর্ড গঠনের জায়গায় রয়েছে মাত্র ৭টিতে (জলপাইগুড়ি, মুর্শিদাবাদ, কাটোয়া, কান্দি, বেলডাঙা, বীরনগর, শান্তিপুর)। আরও লক্ষণীয় হল, কংগ্রেসের কাছ থেকে তৃণমূল ছিনিয়ে নিয়েছে ৪টি পুরসভা (বোলপুর, বিষ্ণুপুর, খড়্গপুর এবং রানাঘাট)। এছাড়া কংগ্রেসের আসন সংখ্যা কমায় ত্রিশঙ্কু অবস্থায় রয়েছে কোচবিহার, জয়নগর-মজিলপুর ও শ্রীরামপুর পুরসভা। কংগ্রেসের আসন কমেছে আরও ১৮টি পুরসভায় (হালিশহর, গোবরডাঙা, বারাসত, গারুলিয়া, উত্তর বারাকপুর, অশোকনগর, চুঁচুড়া, বাঁশবেড়িয়া, বৈদ্যবাটী, উত্তরপাড়া, বারুইপুর, পুরুলিয়া, রঘুনাথপুর, তাহেরপুর, সিউড়ি, রামপুরহাট, সোনামুখী, দিনহাটা)। প্রবল সিপিএমবিরোধী হাওয়ার মধ্যেও কংগ্রেস কোনও আসন বাড়াতে পারেনি ৮টি পুরসভায় এবং একটি আসনও পায়নি ১৫টি পুরসভায়। ফলে পুরনির্বাচনে কংগ্রেসের পক্ষে নয়, তার বিরুদ্ধেই জনমতের প্রতিফলন ঘটেছে।

ভোপাল গ্যাসকাণ্ড

একের পাতার পর

জানিয়েছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ। তিনি দাবি করেছেন, ভোপাল গ্যাসকাণ্ডের সকল অপরাধীদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে, গ্যাসপীড়িত ও তাদের পরিবারগুলিকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং দুর্ঘটনাস্থলকে ভয়ানক বায়ুদূষণ থেকে মুক্ত করার জন্য অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে। আদালত ও প্রশাসনের যুগলবন্দীতে বিচারের যে প্রহসন ঘটানো হল, তার বিরুদ্ধে ৯ জুন সারা ভারত প্রতিবাদ দিবস পালন করার জন্য তিনি আবেদন জানান।"

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci.in